সাধারণের অসাধারণ গল্প

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সাধারণের অসাধারণ গল্প

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)’-এর সফলতার এই দলিলটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না যদি না সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা থাকত।

এই সাফল্যগাথা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর প্রতি, যাদের সার্বিক দিকনির্দেশনা ও নীতিগত সহায়তায় ‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)’ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প’-এর প্রকল্প পরিচালক, চিফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর এবং উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের কনসালটেন্টবৃন্দ এবং পিএমইউ-এর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই সাফল্যগাথা প্রণীত হয়েছে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং প্রাণিসম্পদ মাঠ সহকারীদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও খামারিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগই আজকের এই অদম্য আখ্যানগুলোর মূল চালিকাশক্তি।

কৃতজ্ঞতা সেই সকল সাহসী খামারি ও উদ্যোক্তাদের প্রতি, যারা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন এবং প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আধুনিক প্রযুক্তিতে নিজেদের খামার সাজিয়েছেন এবং তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে, ধন্যবাদ এই সাফল্যগাথার পুস্তিকাটি সংকলন ও সম্পাদনার সাথে জড়িত এক্সপ্রেশানস্ লিমিটেড-এর সৃজনশীল দলকে। আপনাদের লেখনি এবং সৃজনশীলতায় খামারিদের জীবনযুদ্ধ ও বিজয়ের গল্পগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

আমরা সম্মিলিতভাবে একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে অবিচল থাকব– এই আমাদের অঙ্গীকার।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)

পূর্বকথা

বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো আমাদের প্রাণিসম্পদ খাত। এই খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং প্রান্তিক খামারিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে ‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)’।

এই সাফল্যগাথার পুস্তিকাটি কেবল ৩০টি গল্পের সংকলন নয়; এটি সমগ্র প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের সংগ্রামী জীবনের জয়গাথার একটি জীবন্ত চিত্র। এখানে আমরা দেখেছি কীভাবে জামালপুরের সুরুজ্জামান সাইলোপিট প্রযুক্তিতে পশুখাদ্যের অভাব দূর করেছেন, কীভাবে ফরিদপুরের পারভিন আক্তার সামাজিক গ্লানি মুছে ‘ভিলেজ মিল্ক’ ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছেন, কিংবা রংপুরের রোকসানা বেগম মাত্র ১৫০ টাকা থেকে কীভাবে দইয়ের সাম্রাজ্য গড়েছেন। প্রতিটি গল্পই প্রমাণ করে যে, সঠিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সামান্য পুঁজির সঠিক ব্যবহার একটি পরিবারকে অভাবের অন্ধকার থেকে স্বাবলম্বিতার আলোতে নিয়ে আসতে পারে।

LDDP প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা খামারিদের হাতে আধুনিক মিল্কিং মেশিন, ফিড মিল, চিলিং সেন্টার এবং ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য তৈরির প্রযুক্তি তুলে দিয়েছি। এর ফলে কেবল দুধ বা মাংসের উৎপাদনই বাড়েনি, বরং তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার নতুন নারী উদ্যোক্তা। এই ৩০টি সফলতার গল্প আমাদের আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। আমি বিশ্বাস করি, এই আখ্যানগুলো দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ ও প্রান্তিক খামারিদের জন্য এক অনন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

শুভকামনা রইল সেই সকল অদম্য খামারিদের প্রতি, যারা নিজের ভাগ্য বদলানোর পাশাপাশি দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)

সূচিপত্র

১	সংগ্রাম থেকে স্বনির্ভরতা : কাউছার জাহানের অনন্য যাত্রা	৬
২	ছালমার জয়যাত্রা : শূন্য থেকে সফলতা	৮
৩	পদ্মাপাড়ের আলোর সারথি : খামারি মিজানুর রহমান	১০
৪	অভাবের চরে সাফল্যের ছোঁয়া	১২
৫	ব্যর্থতা পেরিয়ে সফলতার পথে হেলাল উদ্দিনের স্বপ্ন	১৪
৬	অঞ্জনা বড়ুয়া : সংগ্রামী জীবনের এক সাফল্যগাথা	১৬
৭	প্রযুক্তির স্পর্শে বদলে যাওয়া জীবন	১৮
৮	এক দুগ্ধ খামারির পরিবর্তনের অভিযাত্রা	২০
৯	একটি প্রকল্প বদলে দিলো মনজিলার জীবনের গল্প	২২
১০	গাভীর খামার থেকে জীবনের নতুন দিগন্তে	২৪
১১	একটি ফিড মিল : সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি	২৬
১২	মিল্ক চিলিং পয়েন্ট : তপ্ত বালু চরের শীতল বিপ্লব	২৮
১৩	কুমকুমের স্বপ্ন এখন দিগন্ত বিস্তৃত	৩০
১৪	মিল্কিং মেশিনের ছোঁয়ায় খামারির হাসি	৩২
১৫	ভেড়ার খামার : আত্মনির্ভরতার জয়যাত্রা	৩৪
১৬	শেখ দই ঘর : ফেরিওয়ালা থেকে ব্যবসায়ী	৩৬
১৭	একজন স্বনির্ভর খামারি : মেঘনা তীরের জয়িতা	৩৮
১৮	গরুর খামারে নতুন সূর্য	৪০
১৯	রিক্ত হাতে পূর্ণতার জয়গান	৪২
২০	আফরোজা খাতুন : স্বপ্ন থেকে সফলতা	৪৪
২১	খামারি মাজকুরা বেগম : বিবর্তনের কারিগর	৪৬
২২	সবুজের বিপ্লবে বেকারত্ব দূরীকরণ	৪৮
২৩	হতাশার মেঘ চিরে : ফিড মিলের কল্যাণে খামারির অগ্রযাত্রা	৫০
২৪	অদম্য পরিশ্রমে তৌহিদের ভাগ্যোন্নয়ন	৫২
২৫	উন্নয়নের ধারায় বরুণার আলোকিত শিক্ষক	৫৪
২৬	শাহিন আক্তারের প্রাপ্তি : শূন্য থেকে সমৃদ্ধি	৫৬
২৭	গাভীর খামারে বন্ধুর পথে তিন বন্ধুর জয়যাত্রা	৫৮
২৮	বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পারভিন আক্তারের উদ্যমের কাহিনি	৬০
২৯	তানিয়া : বর্জ্য থেকে বৈপ্লবিক বিজয়	৬২
৩০	রোকসানার দইঘর : অন্ধকার থেকে আলোর গল্প	৬৪

সংগ্রাম থেকে স্বনির্ভরতা : কাউছার জাহানের অনন্য যাত্রা

জীবন যখন সংকটে পড়ে, মানুষ তখন হয় ভেঙে পড়ে নয়তো ঘুরে দাঁড়ায়। কাউছার জাহানের গল্পটি সেই অদম্য ঘুরে দাঁড়ানোর। ২০২০ সালে স্বামীর আকস্মিক অসুস্থতা আর দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চয়তার মুখে, যার মধ্যে একটি সন্তান আবার অটিজমে আক্রান্ত; তখন ঘরকুনো গৃহবধূ থেকে খামারি হওয়ার এক দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখেন তিনি। আজ সেই কাউছার জাহান কেবল নিজের পরিবারের খুঁটি নন, বরং পুরো সমাজের জন্য এক অনুপ্রেরণার বাতিঘর। তিনি একজন 'জয়িতা'। তার হাত ধরেই রচিত হয়েছে এক নিঃস্ব গৃহবধূর উদ্যোক্তা হওয়ার মহাকাব্য। তিনি এখন এলাকার নারীদের জন্য এক সাহসের নাম।

শুরুটা ছিল মাত্র দুটি দেশি ষাঁড় নিয়ে। অভিজ্ঞতা না থাকায় অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু পালন করতে গিয়ে একটি প্রিয় ষাঁড়কে চোখের সামনে মরতে দেখেন তিনি। চারপাশের মানুষের কটু কথা আর উপহাস তখন বিষের মতো বিঁধছিল, "মেয়ে মানুষ কি আর খামারদারি করতে পারে?" কিন্তু হার মানেননি কাউছার। নিজের হাতে ঘাস কাটা থেকে শুরু করে দিন-রাত গরুর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। ঠিক সেই দুঃসময়ে অন্ধকারের আলোকবর্তিকা হয়ে পাশে দাঁড়ায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)। ২০২১ সালে 'মিয়াজিপাড়া বিফ ফ্যাটেনিং প্রডিউসার গ্রুপ'-এ যোগদানের পর কাউছার জাহানের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি একে একে ১৩টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

আধুনিক গবাদিপশু পালন, পুষ্টি ও বাজার সংযোগ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান তার অগোছালো খামারটিকে একটি বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়। এলডিডিপি প্রকল্প থেকে তিনি পান ঘাস কাটার মেশিন, ট্রলি, পাম্প মোটর, ফ্লোর ম্যাট, বেলচা ও ল্যাক্টোমিটার- যা তার শ্রমকে সহজ করে খামারকে করে তোলে স্বাস্থ্যসম্মত ও আধুনিক। কাউছার জাহানের খামারে আজ অভাবের কোনো ছায়া নেই। বর্তমানে তার খামারে ২৫টি মোটাতাজা করা ষাঁড় রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি ৫টি গাভি নিয়ে একটি সফল ডেইরি ইউনিটও চালু করেছেন। বর্তমানে তার বার্ষিক আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এই আয় দিয়ে তিনি অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা ও সন্তানদের পড়াশোনা নিশ্চিত করছেন। তার এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য তিনি জেলা পর্যায়ে সম্মানজনক 'জয়িতা পুরস্কার ২০২৪' অর্জন করেছেন। কাউছার জাহান গর্বের সাথে বলেন,

> "এলডিডিপি আমাকে জ্ঞান আর সরঞ্জাম দিয়ে স্বাবলম্বী করেছে। আজ আমি শুধু নিজের পরিবার চালাচ্ছি না, বরং এলাকার অন্য নারীদেরও পথ দেখাচ্ছি।"

কাউছার জাহানের লক্ষ্য এখন খামারের পরিসর আরও বাড়ানো এবং একটি টেকসই আধুনিক পশুপালন মডেল হিসেবে গ্রামকে পরিচিত করা। তিনি প্রমাণ করেছেন, সঠিক জ্ঞান আর অদম্য ইচ্ছা থাকলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আর পারিবারিক সংকট কোনোটিই সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না।

ছালমার জয়যাত্রা : শূন্য থেকে সফলতা

ভোরবেলা কুয়াশাভেজা বুড়িচংয়ের শান্ত প্রকৃতিতে যখন দেশি মুরগির ডাক শোনা যায়, তখন ছালমার চোখে ভাসে এক রঙিন আগামীর স্বপ্ন। অথচ এই স্বপ্নের পথটা একসময় ছিল বেশ ধূসর। কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার সাধারণ গৃহিণী ছালমা আজ আর কেবল দশজন সাধারণ নারীর মতো নন; তিনি আজ এলাকার একজন সফল নারী উদ্যোক্তা, যার অনুপ্রেরণায় গ্রামের অন্য নারীরাও এখন সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখছেন।

ছালমার শুরুটা ছিল খুব ছোট। হাতে ছিল মাত্র ১৫-১৬টি দেশি মুরগি আর বুকভরা সাহস। কিন্তু কেবল সাহস দিয়ে তো আর সংসার চলে না! পুঁজির অভাব, পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞানের ঘাটতি আর অভিজ্ঞতাহীনতার কারণে শুরুর দিকে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে তাকে। মুরগির রোগবালাই আর সঠিক যত্নের অভাবে কাঙ্ক্ষিত লাভের মুখ দেখছিলেন না তিনি। কিন্তু ছালমা দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না।

ছালমার এই নিরলস প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দিতে এগিয়ে আসে 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (LDDP)। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে তাকে এই প্রকল্পের একজন সম্ভাবনাময় খামারি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এরপরই তার জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় ছালমাকে আধুনিক পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ ও টিকা প্রয়োগের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুধু হাতে-কলমে শিক্ষাই নয়, প্রকল্প থেকে তাকে একটি আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মুরগির শেড নির্মাণের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া তাকে দেওয়া হয় মুরগির খাবার, পানির পাত্র এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও প্রতিষেধক।

প্রশিক্ষণ আর সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে ছালমা তার খামারটিকে ঢেলে সাজালেন। নিয়মিত টিকা প্রদান আর সুষম খাদ্যের গুণে মুরগির মৃত্যুহার যেমন কমে গেল, তেমনি দ্রুত বাড়তে থাকল উৎপাদন। বর্তমানে তার খামারে ৫০টিরও বেশি দেশি ও ফাউমি মুরগি রয়েছে। ডিম ও মুরগি বিক্রি করে এখন তার প্রতি মাসে গড়ে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা আয় হচ্ছে। এই উপার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি কেবল পরিবারের সচ্ছলতাই ফেরাননি, বরং বুদ্ধিদীপ্তভাবে তা পুনর্বিনিয়োগ করেছেন। মুরগি বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি ছাগল কিনেছেন এবং প্রতি বছর ছাগল বিক্রি করেও বড় অঙ্কের মুনাফা অর্জন করছেন। নিজের আয় দিয়ে পরিবারের জন্য পুষ্টিকর খাবার, উন্নত পোশাক আর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পেরে আজ ছালমা দারুণ আত্মবিশ্বাসী।

ছালমার এই অভাবনীয় সাফল্য আজ পুরো গ্রামে সাড়া ফেলেছে। তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার অন্য নারীরাও এখন ছোট ছোট খামার গড়তে এগিয়ে আসছেন। ছালমা এখন আর কেবল একজন গৃহিণী নন, তিনি এখন গ্রামের অন্য নারীদের জন্য একজন 'পরামর্শক'। গ্রামের নারীরা তার কাছে পরামর্শ নিতে আসেন, শিখতে চান স্বাবলম্বী হওয়ার কৌশল। ছালমার স্বপ্ন এখানেই থেমে নেই। তিনি তার খামারটিকে আরও বড় করতে চান। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো একটি ইনকিউবেটর মেশিন স্থাপন করা, যাতে নিজেই বাচ্চা উৎপাদন করে খামারটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হ্যাচারিতে রূপ দিতে পারেন। তিনি চান তার এই অভিজ্ঞতার আলোয় আলোকিত হোক এলাকার অন্য অবহেলিত নারীরাও।

ছালমার সাফল্যের রহস্য হলো সঠিক প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর দক্ষতা এবং লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে রূপান্তর করার সাহস। নিয়মিত টিকা দান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং আয়ের একটি অংশ খামারে পুনর্বিনিয়োগ করার মাধ্যমেই তিনি তার ব্যবসাটিকে টেকসই করতে পেরেছেন। ছালমা বলেন,

> "প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া এই প্রশিক্ষণ আর পরামর্শ আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। সুযোগ পেলে একজন নারীও পারে নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে।"

বুড়িচংয়ের ছালমা আজ কেবল একজন সফল খামারি নন, তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির একজন শক্তিশালী কারিগর। তার এই গল্পটি প্রমাণ করে যে, সঠিক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে শূন্য হাতেও সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব।

পদ্মাপাড়ের আলোর সারথি : খামারি মিজানুর রহমান

ভোর হওয়ার আগেই যখন বাঘা উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নে পদ্মার কূলঘেঁষা মেঠোপথ জেগে ওঠে, তখন সবার আগে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠেন মিজানুর রহমান। যখন চারপাশ নিস্তব্ধ, তখন তার খামারে শুরু হয় জীবনের উৎসব- গাভির পরিচর্যা, পরিচ্ছন্নতা আর তদারকি। কিন্তু এই প্রাণবন্ত মিজানুরকে বছর কয়েক আগেও ঘিরে ধরেছিল একরাশ হতাশা। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও মিলছিল না সাফল্যের দেখা। আজ সেই মিজানুর কেবল নিজের ভাগ্যই বদলাননি, বরং পুরো এলাকার দুগ্ধ খামারিদের কাছে এক আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

গড়গড়ি ইউনিয়নের উর্বর পলিমাটিতে সোনার ফসল ফলে, কিন্তু মিজানুরের কপালে ছিল কেবল দুশ্চিন্তার ভাঁজ। মাত্র ৫টি গাভি নিয়ে শুরু করা তার ছোট ডেইরি খামারটি ছিল একরকম বিশৃঙ্খল। আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের অভাবে গাভিগুলো থেকে আশানুরূপ দুধ পাওয়া যেত না। এর ওপর ছিল অসহ্য গরম আর দুধ সংরক্ষণের অব্যবস্থাপনা। মাঝেমধ্যেই অবিক্রীত দুধ নষ্ট হয়ে যেত, আবার স্থানীয় মিষ্টির দোকানগুলোতে নামমাত্র মূল্যে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হতেন তিনি। কঠোর শ্রম দিলেও মাস শেষে লাভের অঙ্কটা দিন দিন ছোট হয়ে আসছিল। একসময় মিজানুর ভাবছিলেন–খামারটি আর চালাবেন কি না। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে মিজানুরের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (LDDP)। তিনি বুঝতে পারেন, কেবল পরিশ্রম নয়, সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সঠিক কৌশল ও প্রযুক্তি। প্রকল্পের আওতায় তিনি ডেইরি খামার ব্যবস্থাপনা, দুধের মান নিয়ন্ত্রণ, রোগব্যাধি প্রতিরোধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রকল্পের সহায়তায় তার খামারে স্থাপন করা হয় একটি অত্যাধুনিক 'মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট'। এই একটি পদক্ষেপই মিজানুরের ব্যবসার গতিপথ বদলে দেয়। এছাড়া প্রকল্প থেকে তাকে মিল্ক ক্যান, মিল্ক বাকেট, তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রসহ আধুনিক সব সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। মিজানুরের ভাষায়,

> "আগে কোনো সমস্যা হলে দিশাহারা হয়ে পড়তাম, আর এখন প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান আর পশু হাসপাতালের কর্মকর্তাদের পরামর্শে নিজেই সব সামলাই।"

প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার পর মিজানুর এখন এক অনন্য উচ্চতায়। তার খামারের ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো ছিল বিস্ময়কর : গাভির সংখ্যা ৫টি থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ১৫টি। দুধের উৎপাদন আগে প্রতি গাভি থেকে গড়ে ২.৮ লিটার দুধ মিলত, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪ লিটারে। আগে মাসিক আয় ছিল ৯,০০০ টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৫০০ টাকায় (নিট লাভ)। তিনি এখন আর কেবল দুধ বিক্রি করেন না; বরং দই, ঘি, মিষ্টি ও মাঠা তৈরি করে নিজের ব্র্যান্ডিং তৈরি করেছেন।

মিজানুর রহমান এখন আর একা নন। তিনি নিজের খামারের পাশাপাশি এলাকার ৪০ জন ক্ষুদ্র খামারিকে নিয়ে একটি 'প্রডিউসার গ্রুপ' (PG) গঠন করেছেন। তাদের উৎপাদিত দুধ সংগ্রহ করে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করছেন তিনি। এলাকার খামারিদের একত্র করে নিয়মিত মিটিং পরিচালনা করা, চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রুপকে শক্তিশালী করা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অন্যদের অনুপ্রাণিত করাই এখন তার ব্রত। পদ্মা তীরের এই খামারিরা এখন মিজানুরের চোখে আগামীর স্বপ্ন দেখেন। মিজানুর রহমানের স্বপ্ন আকাশছোঁয়া। তিনি অদূর ভবিষ্যতে তার খামারে গাভির সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০টিতে উন্নীত করতে চান। তার মূল লক্ষ্য হলো একটি 'মিনি প্রসেসিং ইউনিট' স্থাপন করা, যেখান থেকে তার উৎপাদিত দুগ্ধজাত পণ্য পৌঁছে যাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

মিজানুর রহমান আজ প্রমাণ করেছেন, পদ্মার ভাঙনেও যেমন জীবন থমকে থাকে না, তেমনি আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া পেলে একজন প্রান্তিক খামারিও হয়ে উঠতে পারেন সফল উদ্যোক্তা। মিজানুর কেবল একজন স্বপ্নদ্রষ্টা নন, তিনি আজ শত শত খামারির স্বপ্নের সারথি।

অভাবের চরে সাফল্যের ছোঁয়া

উত্তরের জেলা কুড়িগ্রাম, যেখানে ধরলা আর ব্রহ্মপুত্রের ঢেউয়ে মিশে থাকে মানুষের দীর্ঘশ্বাস। নদীভাঙন আর বিধ্বংসী বন্যার সাথে লড়াই করেই এখানকার মানুষের বেঁচে থাকা। দারিদ্র যেখানে ছায়ার মতো পিছু ছাড়ে না, সেই কুড়িগ্রাম পৌরসভার এক সংগ্রামী নারী রিনা বেগম। জীবনের সব প্রতিকূলতা মাড়িয়ে রিনা আজ কেবল নিজের ভাগ্যই বদলাননি, বরং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে কীভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়–তার এক জীবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছেন।

রিনা বেগমের দিন কাটত সীমাহীন অনিশ্চয়তায়। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় দশা। সম্বল বলতে ছিল হাতেগোনা কয়েকটি গাভি। কিন্তু সেই অবলা প্রাণীগুলোর থাকার জায়গা ছিল অত্যন্ত জীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। সামান্য বৃষ্টিতেই মেঝে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যেত, মশা-মাছির উপদ্রবে গাভিগুলো প্রায়ই রোগে আক্রান্ত হতো। দুধের উৎপাদন ছিল যৎসামান্য। নিজের স্বপ্নগুলো যখন ধুঁকে ধুঁকে মরছিল, রিনা তখন অনুভব করেছিলেন প্রাণীর জন্য শুধু খাবারই যথেষ্ট নয়, তাদের জন্য প্রয়োজন একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক আবাসন। হতাশার সেই তপ্ত দুপুরে আশীর্বাদ হয়ে এল 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (LDDP)। রিনা বেগম এই প্রকল্পের প্রডিউসার গ্রুপে (PG) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে তিনি জানতে পারেন 'জলবায়ু সহিষ্ণু খামার'-এর গুরুত্ব। প্রকল্পের সহায়তায় তার বাড়িতে নির্মিত হলো আধুনিক একটি ৫-গাভির শেড। এই শেডটি কেবল চার দেয়ালের কোনো কাঠামো ছিল না; এটি ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অনন্য সমন্বয়। উঁচুতে নির্মিত হওয়ায় এটি যেমন বন্যামুক্ত, তেমনি উন্নত ভেন্টিলেশন বা বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থার কারণে প্রচণ্ড গরমেও গরুগুলো থাকে শান্ত ও সুস্থ। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর সঠিক ড্রেনেজ সিস্টেমের ফলে খামারটি হয়ে উঠল রোগমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে রিনা বেগমের খামারে ঘটে গেল এক অভাবনীয় রূপান্তর। প্রকল্পের আগে যে গাভিটি দিনে মাত্র ৭ লিটার দুধ দিত, সেই গাভিটিই এখন ১২ লিটার দুধ দিচ্ছে। খামারের আধুনিক পরিবেশ গরুগুলোর স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। প্রকল্পের আগে তার মাসিক আয় ছিল ১৩,০০০ টাকা, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২১,০০০ টাকায়। শেডটি শুকনো ও পরিষ্কার থাকায় গাভিদের 'ওলান প্রদাহ' বা ম্যাস্টাইটিস জাতীয় জটিল রোগ এখন শূন্যের কোঠায়।

রিনা বেগম এখন আর কেবল একজন খামারি নন; তিনি আজ একজন দক্ষ প্রশিক্ষক ও পরামর্শক। গ্রামের নারীরা এখন রিনার উঠোনে ভিড় জমান- জানতে চান কীভাবে গোবর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হয়, কীভাবে গর্ভবতী গাভি ও বাছুরের যত্ন নিতে হয়। রিনা হাসিমুখে তাদের শেখান জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুগে টিকে থাকার কৌশল। তার সাফল্য দেখে এলাকার অসংখ্য গৃহবধূ এখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন। রিনা বেগম দীপ্ত কণ্ঠে বলেন,

> “আগে গাভিগুলোর কষ্ট দেখে নিজেরই কান্না আসত। এখন এই আধুনিক শেডের কারণে ওরা সুস্থ থাকে, দুধও বেশি দেয়। আমি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।”

রিনা বেগমের স্বপ্ন এখন আরও বিস্তৃত। তিনি এই টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শেডটিকে কেন্দ্র করে তার খামার আরও বড় করার পরিকল্পনা করছেন। কুড়িগ্রামের ভাঙনপ্রবণ জনপদে রিনা বেগম আজ এক অটল বাতিঘর, যিনি প্রমাণ করেছেন- সঠিক প্রযুক্তি আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে প্রকৃতির বৈরিতা হার মানতে বাধ্য।

ব্যর্থতা পেরিয়ে সফলতার পথে হেলাল উদ্দিনের স্বপ্ন

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে, যেখানে আন্ধারমানিক নদী তার মোহনার দিকে বয়ে চলে, সেই সাগরকন্যা পটুয়াখালীর মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে এখন এক নতুন আশার আলো বইছে। একসময় যে মানুষটি ঋণের বোঝা আর লোকসানের ঘানি টেনে দিশাহারা ছিলেন, আজ তিনি এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের স্পর্শে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছেন। তিনি হেলাল উদ্দিন- একসময়ের হতাশ কৃষক, আজ যিনি আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ পদ্ধতির এক দক্ষ কারিগর।

দীর্ঘদিন ধরে হেলাল উদ্দিন চিরাচরিত উপায়ে গরু পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গরুর আবাসন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা আর রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকায় তার খামারটি ছিল লোকসানের কেন্দ্র। অপুষ্টি, কৃমি আর নিয়মিত রোগবালাইয়ের কারণে তার পশুকুল ছিল জীর্ণশীর্ণ। বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দাম তো দূরের কথা, বছর শেষে লোকসানের ভারে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, একসময় এই ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এনজিওর ঋণের কিস্তি আর পরিবারের আর্থিক অনিশ্চয়তা তাকে দিনরাত তাড়া করে ফিরত। ২০২৪ সাল হেলাল উদ্দিনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার বছর। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে তিনি যুক্ত হন 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের প্রডিউসার গ্রুপে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাকে শুধু পুষ্টিকর খাবার, টিকা বা কৃমিনাশকই দেওয়া হয়নি, বরং তাকে দেওয়া হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির এক মহাঅস্ত্র 'প্রশিক্ষণ'। পশুর স্বাস্থ্যবিধি, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য পরিকল্পনা এবং বাজার সংযোগের ওপর তিনি যে গভীর জ্ঞান অর্জন করলেন, তা তাকে একজন সাধারণ খামারি থেকে একজন দূরদর্শী উদ্যোক্তায় রূপান্তর করল। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহায়তায় তিনি স্থানীয় পাইকার ছাড়াও সরাসরি বড় বাজারের ক্রেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হন।

হেলাল উদ্দিনের খামারে আজ আর হতাশার কোনো চিহ্ন নেই। আধুনিক পরিচর্যার কল্যাণে তার খামারের ষাঁড়গুলো এখন স্বাস্থ্যবান ও চনমনে। তার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্রটি রীতিমতো বিস্ময়কর। আগে যেখানে তার বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ১,৬৮,০০০ টাকা, প্রকল্পের সহায়তায় তা এক লাফে বেড়ে এখন ৫,২০,০০০ থেকে ৬,২০,০০০ টাকায় পৌঁছেছে। আয়ের এই অতিরিক্ত অংশ দিয়ে তিনি তার পূর্বের এনজিও ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন এবং খামারে গরুগুলোর জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত ও আরামদায়ক শেড নির্মাণ করেছেন। গরু বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে খামার বড় করার পর বর্তমানে তার কাছে ৯টি হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় রয়েছে।

হেলাল উদ্দিন এখন কেবল নিজের ভাগ্যই বদলাননি, পুরো এলাকার জন্য এক আদর্শ হয়ে উঠেছেন। তার অভাবনীয় সাফল্য দেখে মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের অন্য খামারিরাও এখন এলডিডিপির সেবা নিতে উন্মুখ। হেলাল উদ্দিন এখন স্থানীয় পর্যায়ে একজন খামার বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তিনি অন্য খামারিদের পরামর্শ দেন কীভাবে পরিকল্পিত উপায়ে পশু পালন করলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যায়। হেলাল উদ্দিনের তৃপ্ত কণ্ঠে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসের সুর,

> "আগে তো নিয়ম না মেনেই গরু পালতাম, লাভ হতো না। এলডিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণে আজ আমি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খামার চালাতে শিখেছি। এখন আমার লক্ষ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাবার তৈরি করা এবং খামারটিকে আরও আধুনিক করে তোলা।"

হেলাল উদ্দিন আজ একটি আদর্শ খামারের নির্মাণ করেছেন, যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের সুব্যবস্থা। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখন সুসংগঠিত। কোরবানি ঈদকে লক্ষ্য রেখে পাইকারি ক্রেতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং পশুর সংখ্যা বাড়িয়ে নিজের এলাকায় একটি বড় 'মিট হাব' গড়ে তোলার স্বপ্ন এখন তার চোখেমুখে। আন্ধারমানিক নদীর ঢেউয়ের মতো হেলাল উদ্দিনের এই এগিয়ে চলা আজ উপকূলের প্রতিটি খামারির হৃদয়ে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে।

অঞ্জনা বড়ুয়া : সংগ্রামী জীবনের এক সাফল্যগাথা

কক্সবাজারের রামু উপজেলার রাজারকুল। পাহাড় আর সমতলের এই রম্যভূমিতে অঞ্জনা বড়ুয়ার জীবন কাটছিল এক নতুন সকালের অপেক্ষায়। চার সদস্যের পরিবারে স্বামীর সীমিত আয় দিয়ে টেনেটুনে সংসার চালানো ছিল এক নিত্যদিনের যুদ্ধ। অভাবের সেই দিনগুলিতে অঞ্জনা কেবল ভাবতেন- সন্তানদের ভবিষ্যৎ কি এভাবেই অনিশ্চয়তায় কাটবে? আজ সেই অনিশ্চয়তা পেছনে ফেলে অঞ্জনা বড়ুয়া এখন রামুর গর্বিত এক সফল খামারি।

অঞ্জনার ছোটবেলা থেকেই পশুপালনে আগ্রহ ছিল। বাড়িতে একটি দেশি গরু থাকলেও ছিল না আধুনিক প্রযুক্তি বা সঠিক পুষ্টির ধারণা। ফলে সেই গরু থেকে আয় ছিল যৎসামান্য। কিন্তু অঞ্জনা বিশ্বাস করতেন, যদি সঠিক প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়, তবে ঘরের কাজ সামলেও স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব। তার সেই বিশ্বাস বাস্তবে রূপ নিল ২০২২ সালে, যখন তিনি এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের 'পূর্ব রাজারকুল ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি)'-এ যুক্ত হলেন। পিজি-তে যোগ দিয়ে অঞ্জনা কেবল গরু পালনই শেখেননি, বরং একজন সচেতন ব্যবসায়ীর গুণাবলি অর্জন করেছেন। তিনি 'গবাদিপশুর উন্নত জাত পরিচিতি ও ডেইরি ব্যবস্থাপনা', 'ইউএমএস (UMS), সাইলেজ এবং আধুনিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনা', 'পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু খামার পরিকল্পনা, এবং 'জেন্ডার সমতা ও পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিতকরণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

অঞ্জনা এখন আর আগের মতো শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেন না। তিনি খামারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে অভাবনীয় ফল পেয়েছেন। আজ তার খামারে গরুর সংখ্যা গাভি, বকনা ও ষাঁড়সহ মোট ১২টি। দৈনিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে ৬০ লিটার। নিয়মিত টিকাদানের ফলে রোগবালাইয়ের হার প্রায় শূন্য। ব্যবহার করছেন চপার মেশিন, সাইলেজ, ইউএমএস, ইত্যাদি প্রযুক্তি। অঞ্জনার কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি মিলেছে 'প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৪'-এ। গবাদিপশু ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জয়ের মাধ্যমে তিনি এখন এলাকার নারীদের কাছে এক আইকন। তার স্বামী এখন খামারে তাকে সহযোগিতা করেন, আর সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চলে অনায়াসে। অঞ্জনা বলেন,

> "খামার করার জন্য অবশ্যই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রয়োজন, যা আমি এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে পেয়েছি। এখন আমি নিজে স্বচ্ছল এবং অন্যদেরও এই পথে আসার উৎসাহ দিচ্ছি।"

অঞ্জনা এখন স্বপ্ন দেখছেন তার খামারকে আরও বড় করার। তিনি একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শেড নির্মাণ করতে চান এবং শুধু দুধ নয়, বরং দই ও ঘিয়ের মতো দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করে নিজের ব্যবসাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেইরি ব্র্যান্ডে রূপান্তর করতে চান।

প্রযুক্তির স্পর্শে বদলে যাওয়া জীবন

উত্তরাঞ্চলের প্রবেশপথ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া। এখানকারই সন্তান রেজাউল করিম এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ২০১৮ সালে ডেইরি খামার শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ছিল বিশাল এক ব্যবধান। আধুনিক জ্ঞান আর প্রযুক্তির অভাবে সেই স্বপ্ন যখন ফিকে হতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (LDDP)-এর স্পর্শে রেজাউলের খামারে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আজ রেজাউল কেবল একজন খামারি নন, তিনি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডেইরি ব্যবসার এক অনন্য কারিগর।

রেজাউল করিম ১৫টি উন্নত জাতের বকনা গরু নিয়ে খামার শুরু করলেও প্রথম কয়েক বছর তাকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। টিকাদান ও কৃমিনাশক সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় রোগবালাই লেগেই থাকত। খাদ্যের উচ্চমূল্য আর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে লাভের বদলে লোকসানের পাল্লাই ভারী হচ্ছিল। এর ওপর করোনার মহামারি পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তোলে। খামার চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ যখন তলানিতে, ঠিক তখনই এলডিডিপি প্রকল্প তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে। এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে রেজাউল বিজ্ঞানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। সাইলেজ প্রযুক্তি, উন্নত জাতের ঘাস চাষ এবং বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি খামারের খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর মন্ত্র শিখে নেন।

তবে তার খামারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আধুনিক 'মিল্কিং মেশিন'। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুধ দোহনের এই যন্ত্রটি রেজাউলের খামারে এনেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন। হাতে দোহনের বাড়তি খরচ ও সময় দুটোই এখন বেঁচে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় সুফল হলো ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহের ঝুঁকি কমে গেছে এবং দুধের গুণগত মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত হয়েছে। রেজাউল বলেন,

> "মিল্কিং মেশিন আর হিউমিডিটি মিটার আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছে। এখন অনেক গরমেও আমি গরুর সঠিক যত্ন নিতে পারি, ফলে দুধের উৎপাদন একই রকম থাকে।"

প্রকল্পের ছোঁয়ায় রেজাউলের খামার এখন একটি আধুনিক ডেইরি হাবে পরিণত হয়েছে। ১৫টি গাভি থেকে বেড়ে এখন তার খামারে রয়েছে মোট ৪০টি গাভি, ২৫টি বাছুর ও ৫টি বকনা। খামার থেকে আগে তার মাসিক আয় ছিল ৬০,০০০ টাকা, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫০,০০০ টাকায়। রেজাউল এখন ৫ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, যারা নিপুণভাবে খামার পরিচালনা করছেন। ১৭ বিঘা জমিতে চাষ করা 'জারা ঘাস' তার খামারের সুষম খাদ্যের জোগান দিচ্ছে। রেজাউল করিমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখন অনেক বড়। তিনি চান প্রতিটি গাভি থেকে গড়ে অন্তত ১৭ লিটার দুধ উৎপাদন নিশ্চিত করতে। আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা আর উচ্চ উৎপাদনশীল গাভির সংখ্যা বাড়িয়ে তার খামারটিকে তিনি দেশের অন্যতম সেরা ডেইরি মডেলে রূপান্তর করতে চান। রেজাউলের ভাষায়, "এলডিডিপি প্রকল্প আমার জীবন বদলে দিয়েছে। এই সাফল্য আমাকে নতুনভাবে বাঁচার সাহস জুগিয়েছে।"

রেজাউল করিম এখন আর একা নন। তিনি তার প্রোডিউসার গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে প্রতি মাসে সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছেন, যা ক্ষুদ্র খামারিদের আর্থিক নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত করছে। তাকে দেখে এলাকার অন্য খামারিরাও এখন জীবনিরাপত্তা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন। রেজাউল তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন জারা ঘাসের কাটিং এবং আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান।

এক দুগ্ধ খামারির পরিবর্তনের অভিযাত্রা

জামালপুর জেলার ফুলকোচা গ্রাম। ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা এই জনপদ কৃষিনির্ভর হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর পশুখাদ্যের অভাব ছিল এখানকার খামারিদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এই প্রতিকূলতার মাঝেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াইয়ে নেমেছিলেন মোঃ সুরুজ্জামান। একসময় যার দুই ছেলের পড়াশোনা আর সংসারের খরচ চালানো দায় ছিল, আজ তিনি ৩৮ লক্ষ টাকার গবাদিপশুর মালিক। এখন সুরুজ্জামান কেবল একজন সফল খামারিই নন, তিনি ফুলকোচা গ্রামের একজন 'প্রযুক্তি শিক্ষক'। তার দেখাদেখি গ্রামের অনেক যুবক এখন সাইলেজ তৈরি ও উন্নত জাতের ঘাস চাষে আগ্রহী হচ্ছে। তিনি পিজির সদস্যদের হাতে-কলমে শিখিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে প্রতিকূল আবহাওয়াতেও পশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা যায়। তার এই উত্তরণের নেপথ্যে রয়েছে এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের আধুনিক প্রযুক্তি আর সুরুজ্জামানের অদম্য পরিশ্রম।

সুরুজ্জামান মূলত কৃষিকাজ ও দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে কোনোমতে সংসার চালাতেন। কিন্তু পশুখাদ্যের উচ্চমূল্য আর গবাদিপশুর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে লাভের মুখ দেখছিলেন না। উপায় না পেয়ে তিনি মেলান্দহ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকেই শুরু হয় তার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। এলডিডিপি প্রকল্পের 'ফুলকোচা ডেইরি পিজি'-তে যোগদানের পর তিনি আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল রপ্ত করেন। ১৮ শতাংশ জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের পাশাপাশি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত 'গ্রাস চপার মেশিন' দিয়ে তিনি অল্প সময়ে পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুত করছেন। এটি তার শ্রম ও সময় দুটোই বাঁচিয়ে দিয়েছে। খামারিদের জন্য খরার মৌসুমে ঘাস পাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ। সুরুজ্জামান সাইলোপিট পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করে 'সাইলেজ' তৈরি করছেন। ফলে সারা বছর তার খামারে খাদ্যের কোনো সংকট থাকে না। ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (UMS) এবং নিয়মিত মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC)-এর সেবায় তার খামারে গবাদিপশুর মৃত্যুহার এখন শূন্যের কোঠায়।

এলডিডিপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ছিল ১০টি এবং বর্তমানে সুরুজ্জামানের খামারে ১২টি দুগ্ধবতী গাভিসহ মোট ১৮টি পশু রয়েছে। এখন প্রতিদিন প্রায় ১২০ লিটার দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। তার খামারের পশুর বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা। দৈনিক দুধ বিক্রি করে তার আয় হচ্ছে ৭,২০০ টাকা। সুরুজ্জামান বলেন,

> "এক সময় পরিবারের খাবার জোগানোই ছিল আমার কাছে যুদ্ধ। এলডিডিপি আমাকে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে। আজ আমি শুধু সন্তানদের পড়ালেখার খরচই চালাচ্ছি না, বরং শান্তিতে ঘুমাতেও পারছি।"

সুরুজ্জামানের এই সংগ্রামী জীবন আজ জামালপুরের খামারিদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি প্রমাণ করেছেন, কেবল হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, তার সাথে যদি আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক মিশ্রণ ঘটে, তবে যেকোনো প্রান্তিক কৃষকই হতে পারেন সফল উদ্যোক্তা।

একটি প্রকল্প বদলে দিলো মনজিলার জীবনের গল্প

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বাঙ্গালা ইউনিয়নে সরকারি খাস জমিতে মনজিলা খাতুনের একচিলতে ঘর। একসময় সেই ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর হাহাকার ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। ঋণের বোঝা আর পাওনাদারের কড়া নাড়ানি মনজিলাকে প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ফিরত। মনজিলা খাতুনের চার সদস্যের সংসারে অভাব ছিল ছায়ার মতো। স্বামী অন্যের জমিতে শ্রম দিতেন, আর মনজিলা অনেক ধারদেনা করে ৪০টি হাঁস নিয়ে ছোট একটি খামার শুরু করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস পালনের ন্যূনতম ধারণা না থাকায় বিপত্তি ঘটত পদে পদে। মড়ক লেগে হাঁস মারা যেত, ডিমের উৎপাদন ছিল যৎসামান্য। স্বপ্ন বারবার ব্যর্থতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যার চোখে আকাশছোঁয়া স্বপ্ন থাকে, তাকে কি আর অভাবের অন্ধকার আটকে রাখতে পারে? আজ সেই মনজিলা কেবল একজন সফল খামারিই নন, বরং গ্রামীণ নারী জাগরণের এক জীবন্ত বাতিঘর। যে মনজিলা একদিন পাওনাদারের ভয়ে দিশাহারা থাকতেন, আজ তিনি সেই ঋণের জাল ছিঁড়ে নিজের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করছেন। স্বামীকে যোগাচ্ছেন আর্থিক শক্তি।

২০২১ সালে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে মনজিলা 'ঘোনা হাঁস প্রডিউসার গ্রুপ'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। প্রকল্পের নিবিড় প্রশিক্ষণ তাকে শিখিয়ে দিল আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হাঁস পালনের কলাকৌশল। তিনি শিখলেন রোগ প্রতিরোধের সঠিক নিয়ম, সময়মতো টিকাদান এবং সুষম প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব। শুধু প্রশিক্ষণই নয়, প্রকল্প থেকে তাকে দেওয়া হলো হাঁসের খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র, উন্নতমানের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় কৃমিনাশক ওষুধ। এই সহায়তা মনজিলার খামারে যেন জাদুকরী প্রাণ ফিরিয়ে দিল। প্রকল্পের ছোঁয়ায় মনজিলার ছোট খামারটি আজ এক বিশাল কর্মযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। ৪০টি হাঁস দিয়ে শুরু করা সেই খামারে এখন ৬০০টি চনমনে হাঁস রয়েছে। খামার থেকে প্রতিদিন প্রায় ৪৫০টি ডিম পাওয়া যাচ্ছে। আগে যেখানে তার মাসিক আয় ছিল মাত্র ৫,০০০ টাকা, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০,০০০ টাকায়। আয়ের টাকায় তিনি ৩০ শতক আয়তনের একটি পুকুর ইজারা নিয়েছেন এবং বসতবাড়ির পাশে ৬ শতক জমি কিনে একটি দৃষ্টিনন্দন খামার তৈরি করেছেন। মনজিলার আগামীর পরিকল্পনা হলো তার এই খামারটিকে আরও প্রসারিত করা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সেটিকে একটি আধুনিক হ্যাচারিতে রূপান্তর করা।

সুযোগ আর সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরাও পারেন ধূসর জীবনে সাফল্যের সোনালি রং ছড়িয়ে দিতে। মনজিলা খাতুন আজ কেবল নিজের সংসারের হালই ধরেননি, তিনি পুরো এলাকার নারীদের জন্য এক আদর্শ উদ্যোক্তা। স্থানীয় নারীরা তার কাছে পরামর্শ নিতে আসেন, শীতকালে হাঁসের বাড়তি যত্ন কীভাবে নিতে হয় কিংবা কোন রোগে কী প্রতিষেধক দিতে হয়। মনজিলার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের অনেকে তার খামার থেকে ডিম কিনে বাচ্চা ফুটিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন। মনজিলার ভাষায়,

> "এলডিডিপি আমাকে শুধু হাঁস পালন শেখায়নি, ব্যাবসায়িক ঝুঁকি মোকাবিলা আর বিপণনের কৌশলও শিখিয়েছে। এখন আমি ঘরে বসেই মোবাইলে আমার ব্যবসা পরিচালনা করি।"

গাভীর খামার থেকে জীবনের নতুন দিগন্তে

জামালপুর জেলার নয়ানগর। ব্রহ্মপুত্র নদের পলিমাটিতে গড়া এই জনপদে মানুষের সংগ্রাম চিরকালের। এই গ্রামেরই এক যুবক ছাব্বিরউল্লাহ, যার পরিচয় ছিল কেবল এক বর্গাচাষির সন্তান হিসেবে। বাবার সাথে পরের জমিতে ঘাম ঝরানোই ছিল যার নিয়তি, সেই ছাব্বিরউল্লাহ আজ নয়ানগরের এক জীবন্ত কিংবদন্তি। তার খামারের ৩২টি গরু আজ কেবল সম্পদ নয়, বরং এক অদম্য সংগ্রামের স্মারক। ছাব্বিরউল্লাহ 'মালঞ্চ ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ'-এর সদস্য হয়ে এলডিডিপি থেকে এমন কিছু শিখেছেন, যা তার খামারের আমূল পরিবর্তন এনেছে। তিনি এখন কেবল গরু পালেন না, তিনি জানেন কীভাবে হাইড্রোফোনিক পদ্ধতিতে মাটি ছাড়াই ঘাস উৎপাদন করতে হয় বা কীভাবে সাইলেজ আর ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র বানিয়ে গরুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে হয় অথবা কীভাবে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট দিয়ে বর্জ্যকে জ্বালানিতে রূপান্তর করতে হয়। ছাব্বিরউল্লাহ এখন শুধু নিজের ভাগ্য বদলাননি, তিনি নয়ানগরের কয়েক গ্রামের খামারিদের 'মডেল'। তার পরামর্শে এলাকার ছোট ছোট খামারিরা এখন দ্রুত বর্ধনশীল জাতের গাভি কিনছে। তিনি নিজেই দুধ সরাসরি মিষ্টির দোকান ও ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেন, যা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে খামারিদের লাভ নিশ্চিত করছে।

সংসারের অভাব ঘোচাতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে সত্তর হাজার টাকা দিয়ে একটি বকনা বাছুর কিনেছিলেন ছাব্বিরউল্লাহ। শুরুটা ছিল কঠিন। আধুনিক জ্ঞান না থাকায় খামারে রোগবালাই লেগেই থাকত। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়ে যাওয়ায় যখন পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল, ঠিক তখনই ছাব্বিরউল্লাহর জীবনে বসন্ত নিয়ে এল এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্প। এলডিডিপি প্রকল্পের ছোঁয়ায় ছাব্বিরউল্লাহর খামারে এখন গরুর সংখ্যা ১২টি থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২টি, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা! এছাড়া দৈনিক ১০০ থেকে ১২০ লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে। দুধ বিক্রি করে মাসে তার আয় এখন ২ লক্ষ টাকারও উপরে।

ছাব্বিরউল্লাহর খামারে পা রাখলে দেখা যায় এক সুশৃঙ্খল পরিবেশ। উঁচু ও শুকনো মেঝে, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আর বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। তিনি নিজের ২ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাস চাষ করেন এবং 'চপার মেশিন' দিয়ে তা কেটে গরুর খাদ্য সাশ্রয় করেন। ছাব্বিরউল্লাহর ভাষায়,

> “আগে প্রযুক্তির অভাবে দুধের ন্যায্যমূল্য পাইতাম না, এখন আয় দ্বিগুণ হয়েছে। গাভির রোগবালাই নেই বললেই চলে, আর সঠিক খাবারে ওদের গর্ভধারণ ক্ষমতাও বেড়েছে।”

বর্গাচাষি বাবার সেই মন খারাপ করা ছেলেটি আজ ব্রহ্মপুত্রের তীরের নয়ানগরকে সত্যি সত্যিই এক 'নতুন নগরে' রূপান্তর করেছেন। ছাব্বিরউল্লাহ প্রমাণ করেছেন, মেধা আর সঠিক কারিগরি সহায়তা থাকলে মাটির ঘরকেও সাফল্যের প্রাসাদে রূপান্তর করা সম্ভব।

একটি ফিড মিল : সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি

নীলফামারী জেলার কামারপুকুর। নামেই যার ঐতিহ্য, সেখানেই আজ এক নতুন বিপ্লবের গল্প লিখছেন আব্দুর রাজ্জাক। ৫টি গাভি নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই খামারি আজ নীলফামারীর শত শত খামারিদের কাছে এক আস্থার নাম। বাজারের চড়া দামের পুষ্টিহীন ও ভেজাল খাদ্যের ভিড়ে রাজ্জাক তৈরি করেছেন এক নিরাপদ বলয়, যেখানে পশুর স্বাস্থ্য আর খামারির লাভ- দুটোই নিশ্চিত।

শুরুতে আব্দুর রাজ্জাক যখন ডেইরি খামার শুরু করেন, তখন তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ছিল পশুখাদ্য। বাজারের প্রচলিত খাদ্যে যেমন ছিল উচ্চমূল্য, তেমনি ছিল পুষ্টির অভাব আর ভেজালের ভয়। চড়া দামের খাবার খাইয়েও পশুর সঠিক বৃদ্ধি হচ্ছিল না, উল্টো লোকসানের পাল্লা ভারী হচ্ছিল। রাজ্জাক বুঝতে পারলেন, খাদ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে খামার টেকানো অসম্ভব। তিনি নিজ উদ্যোগে হাতে মিক্স রেশন ও সাইলেজ তৈরি শুরু করেন। কিন্তু হাতে খাবার বানানো ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমের ও সময়সাপেক্ষ কাজ। আব্দুর রাজ্জাকের এই উদ্ভাবনী চেষ্টা নজর কাড়ে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের। এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি ১০ লক্ষ টাকার 'স্মল স্কেল ফিড মিল' অনুদান পান। এই অর্থ দিয়ে তিনি ক্রাশার, মিক্সার আর পিলেট মেশিন কিনে স্থাপন করেন নিজের প্রতিষ্ঠান 'আশা এগ্রো ফিড'। যেখানে আগে সারাদিন খেটেও সামান্য খাবার তৈরি হতো, এখন মাত্র ৩০ মিনিটেই তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের সুষম ফিড। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আব্দুর রাজ্জাকের অর্থনৈতিক ও ব্যাবসায়িক চিত্রে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। ফিড মিল স্থাপনের আগে তার মাসিক আয় ছিল ৫০-৬০ হাজার টাকা, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকায়। খাদ্যের খরচ কমায় ও পুষ্টি নিশ্চিত হওয়ায় তার গাভির সংখ্যা ৫টি থেকে বেড়ে ৯টিতে দাঁড়িয়েছে এবং খামারের নিজস্ব আয় ২০ হাজার থেকে বেড়ে ৬০ হাজারে পৌঁছেছে।

আব্দুর রাজ্জাক আজ কেবল নিজের খামারের প্রয়োজন মেটান না, বরং এলাকার ছোট ছোট খামারিদের কাছে বাজারের চেয়ে কম মূল্যে মানসম্মত ভেজালমুক্ত ফিড সরবরাহ করছেন। তিনি এখন একজন দক্ষ 'ফিড স্পেশালিস্ট'। তিনি পশুর বয়স ও চাহিদা অনুযায়ী আলাদা আলাদা পুষ্টিমানের খাবার তৈরি করেন। তার এই উদ্যোগের ফলে স্থানীয় খামারিরা এখন পশুখাদ্য নিয়ে নিশ্চিন্ত। তিনি তার এই ছোট ফিড মিলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে তুলতে চান। যেখানে আরও অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে। তার লক্ষ্য হলো নীলফামারী জেলা থেকে ভেজাল পশুখাদ্যের অভিশাপ দূর করা এবং একটি টেকসই ও নিরাপদ প্রাণিসম্পদ খাত গড়ে তোলা। কামারপুকুরের এই 'আশা এগ্রো ফিড' আজ উত্তরাঞ্চলের ডেইরি খামারিদের নতুন এক আশার আলো।

রাজ্জাক মনে করেন, একটি খামারের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য। তিনি বলেন,

> "স্মল স্কেল ফিড মিল আমার জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। আমি চাই প্রতিটি খামারি যেন সাশ্রয়ী মূল্যে সঠিক পুষ্টির খাবার পায়।"

মিল্ক চিলিং পয়েন্ট : তপ্ত বালু চরের শীতল বিপ্লব

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার ২২ পাড়া গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের বিশাল চরাঞ্চলের এই জনপদে টিকে থাকা মানেই প্রকৃতির সাথে পাঞ্জা লড়া। এখানকার মানুষের প্রধান সম্বল গবাদিপশু। কিন্তু চরের তপ্ত রোদ আর মাইলের পর মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল ডেইরি খামারিদের প্রধান শত্রু। সকালে দোহন করা খাঁটি দুধ শহরের বাজারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে নষ্ট হয়ে যেত, নতুবা পানির দরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে হতো। চরের সেই হতাশা মাখা দিনগুলোকে জয় করেছেন মোঃ ফিরোজ মিয়া–এলডিডিপি (খউউচ) প্রকল্পের এক 'শীতল' জাদুকরী ছোঁয়ায়।

ফিরোজ মিয়া অনেকদিন ধরেই গাভি পালন করছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের চরে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই নাজুক যে, দুধ বাজারজাত করা ছিল এক দুঃস্বপ্নের মতো। ভ্যান বা নৌকায় করে শহরের বাজারে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লাগত। গরম আবহাওয়ায় দুধ প্রায়ই টক হয়ে যেত কিংবা ফেটে যেত। ফিরোজ মিয়ার চোখের সামনে কষ্টের ধন দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার দৃশ্য ছিল নিত্যদিনের। আর্থিক ক্ষতি আর মানসিক হতাশায় তিনি যখন খামার বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, ঠিক তখনই এলডিডিপি তার এলাকায় নিয়ে এল আধুনিক প্রযুক্তির সমাধান। এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় ফিরোজ মিয়ার এলাকায় স্থাপন করা হলো একটি 'মিল্ক চিলিং পয়েন্ট'। এটি কেবল একটি যন্ত্র নয়, এটি ছিল ২২ পাড়ার খামারিদের জন্য এক নির্ভরতার কেন্দ্র। ফিরোজ মিয়া প্রশিক্ষণ নিলেন দুধের বিশুদ্ধতা যাচাই, মান নিয়ন্ত্রণ এবং দুধ সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার ওপর। এখন আর দুধ নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। দোহনের পরপরই দুধ চিলিং মেশিনে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়, যা দীর্ঘক্ষণ দুধের গুণগত মান অটুট রাখে।

চিলিং পয়েন্ট স্থাপনের পর ফিরোজ মিয়ার খামারে যেন জোয়ার এল। এখন আর তড়িঘড়ি করে দুধ নিয়ে বাজারে ছুটতে হয় না। চিলিং পয়েন্টে দুধ জমা হওয়ায় বড় বড় মিল বা মিষ্টির দোকানগুলো এখন চরে এসে দুধ নিয়ে যায়।

দুধ নষ্ট হওয়া বন্ধ হওয়ায় এবং ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় ফিরোজ মিয়ার আয় আগের চেয়ে ৩০-৪০% বেড়েছে। ফিরোজ মিয়ার এই কেন্দ্রে এখন আরও ২০-২৫ জন খামারি নিয়মিত দুধ জমা দেন। চর এলাকায় গড়ে উঠেছে একটি সমৃদ্ধ দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র। ফিরোজ মিয়া হাসিমুখে বলেন,

> "আগে দুধ বেচা নিয়া চিন্তায় থাকতাম। হাটে পৌঁছানোর আগেই দুধ টক হইয়া যাইত। এখন চিলিং মেশিন থাকায় আমরা সহজেই দুধ রাখি, ভালো দামে বেচি। প্রকল্পটা আমাদের জীবনটাই বদলাই দিছে।"

ফিরোজ মিয়া এখন আর শুধু লোকসান ঠেকানোর কথা ভাবেন না, তিনি এখন সঞ্চয় করেন। তার সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যয় এখন নিশ্চিত। এই সাফল্যের পর তিনি খামারে গাভির সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। তার স্বপ্ন–চরাঞ্চলেই একটি বিশাল আধুনিক খামার গড়ে তোলা, যেখানে চরের অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ২২ পাড়ার এই মিল্ক চিলিং পয়েন্ট আজ প্রমাণ করেছে- যদি সঠিক প্রযুক্তি আর বাজার সংযোগ থাকে, তবে ব্রহ্মপুত্রের দুর্গম চরকেও একটি লাভজনক ডেইরি হাবে রূপান্তর করা সম্ভব। ফিরোজ মিয়া আজ চরাঞ্চলের শত শত খামারির কাছে এক 'শীতল বিপ্লবের' নায়ক।

কুমকুমের স্বপ্ন এখন দিগন্ত বিস্তৃত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বটতলী গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে চলা শঙ্খ নদীর স্রোত যেমন চিরন্তন, কাজী কুমকুমের সংসারে অভাবটাও ছিল তেমনই। ২০১৭ সালে একটি মাত্র ফ্রিজিয়ান গরু নিয়ে যখন তিনি খামারি জীবনের যাত্রা শুরু করেন, তখন স্বপ্ন ছিল দুবেলা দুমুঠো ভাতের নিশ্চয়তা। কিন্তু দুধ বিক্রির যৎসামান্য আয়ে যখন গরুর খাদ্য খরচই উঠত না, তখন কুমকুমের স্বপ্নগুলো শঙ্খের জোয়ারে ভেসে যেতে বসেছিল। আজ সেই কুমকুমই আনোয়ারার এক গর্বিত আইকন, যার হাত ধরে বদলে গেছে এলাকার আরও দশজন নারীর জীবন। কুমকুম আজ প্রমাণ করেছেন, সঠিক প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনী চিন্তা থাকলে একজন সাধারণ গৃহবধূও হয়ে উঠতে পারেন আধুনিক ডেইরি শিল্পের কর্ণধার।

করোনাকালীন সময়ে যখন বাজারের সব দুয়ার বন্ধ, তখন অবিক্রিত দুধ নিয়ে কুমকুম চোখে সর্ষে ফুল দেখছিলেন। হাতে দুধ থেকে দই বা ঘি বানানো ছিল হাড়ভাঙা খাটুনি আর সময়সাপেক্ষ কাজ। সঠিক পরিচর্যার অভাবে খামারে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পাল্লাই ছিল ভারী। ঠিক তখনই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার। তার পরামর্শে কুমকুম যোগ দিলেন এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের 'বটতলী ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপে'। ২০২১ সালে এলডিডিপি প্রকল্প থেকে কুমকুম একটি 'মিল্ক ক্রিম সেপারেটর' মেশিন পান। এই একটি যন্ত্র তার পুরো ব্যাবসায়িক মডেলে বিপ্লব এনে দিল। দুধ থেকে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে ক্রিম আলাদা করার এই প্রযুক্তি কুমকুমকে সুযোগ করে দিল দুগ্ধজাত পণ্যের বিশাল বাজারে প্রবেশের। তিনি কাঁচা দুধ বিক্রির বদলে শুরু করলেন ঘি, দই, ছানা আর মিষ্টি তৈরি।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার কুমকুমের জীবনে এনেছে অভাবনীয় উন্নতি। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভিপ্রতি দুধের উৎপাদন ৪ লিটার থেকে বেড়ে এখন ১০ লিটারে পৌঁছেছে। বর্তমানে তিনি ৮টি গাভির মালিক। দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করে তার মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে এখন প্রায় ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। স্বামী ও পরিবারকে সাথে নিয়ে তিনি নিজস্ব দোকান দিয়েছেন। তার দোকানের খাঁটি ও ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি ঘি, ছানা, মালাই আর চমচমের স্বাদ এখন আনোয়ারার মানুষের মুখে মুখে। কুমকুমের ভাষায়,

> "দুধ নয়, দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করি, সফলতার জীবন গড়ি- এই স্লোগানই আমার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। এখন আমি লাভের টাকায় একটি পাকা বাড়িও করেছি।"

কুমকুম আখতারকে দেখে পিজি'র অন্যান্য খামারিরাও এখন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন। স্বাস্থ্যসচেতন ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখে তিনি কোনো ক্ষতিকর উপাদান ছাড়াই তার পণ্যগুলো মোড়কজাত করেন, যা স্থানীয় বাজারে তাকে এক অনন্য ব্রান্ড ইমেজ দিয়েছে। কুমকুমের স্বপ্ন এখন দিগন্ত বিস্তৃত। তিনি তার খামারে গরুর সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করতে চান, যেখান থেকে প্রতিদিন ১০০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হবে। তার লক্ষ্য হলো আরও ৫০ জন নারীকে এই সফলতার মিছিলে যুক্ত করা।

মিল্কিং মেশিনের ছোঁয়ায় খামারির হাসি

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ। সবুজে ঘেরা এই জনপদে প্রাণিসম্পদের অমিত সম্ভাবনা থাকলেও সনাতন পদ্ধতির বেড়াজালে খামারিদের লাভ ছিল সীমিত। এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে আধুনিক প্রযুক্তির আবাহন ঘটিয়েছেন দক্ষিণ হুলাইন গ্রামের তরুণ খামারি আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল। যেখানে একসময় গাভির ওলান প্রদাহ (ম্যাস্টাইটিস) আর শ্রমিক সংকটে খামার ছিল লোকসানের মুখে, আজ সেখানে মিল্কিং মেশিনের যান্ত্রিক গুঞ্জনে বইছে সমৃদ্ধির বাতাস।

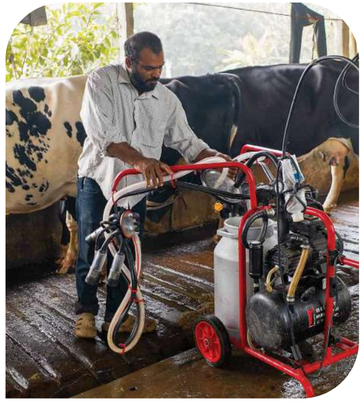

২০২২ সালের আগের কথা। রাসেলের ২০টি দুগ্ধবতী গাভি থাকলেও শান্তিতে ছিল না খামার। হাত দিয়ে দুধ দোহনের ফলে সংক্রমণের কারণে মাসে ৮-৯টি গাভি মারাত্মক ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত হতো। চিকিৎসা খরচ মেটাতেই লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেত। এর ওপর দোহনের জন্য অতিরিক্ত শ্রমিকের পেছনে মাসে গুণতে হতো বড় অংকের টাকা। লোকসানের ভারে রাসেলের খামারটি যখন ডুবতে বসেছিল, তখনই আলোর দিশারী হয়ে এলো 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' (LDDP)। এলডিডিপি প্রকল্পের অধীনে 'হাবিলাসদ্বীপ ডেইরি পিজি' গঠিত হওয়ার পর রাসেলের খামার পরিচালনার ধারণা আমূল বদলে যায়। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণে তিনি শিখলেন কীভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খামার পরিচালনা করতে হয়। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এলো যখন পিজি থেকে তিনি একটি 'মিল্কিং মেশিন' ব্যবহারের সুযোগ পেলেন। এই একটি যন্ত্র রাসেলের খামারে অভাবনীয় জাদুকরী প্রভাব নিয়ে এল।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ আর আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে রাসেলের খামারে আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। গাভির সংখ্যা ২০টি থেকে হয়েছে ৫০টি, দৈনিক দুধ উৎপাদন ১৪০ লিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২০ লিটার। আগে যেখানে মাসিক চিকিৎসা খরচ ছিল ৬০ হাজার টাকা, সেখানে আজ তা কমে এসেছে মাসিক ২০ হাজার টাকায়। শ্রমিক খরচও কমে গেছে, মাসিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা থেকে কমে এসেছে ৮০ হাজার টাকায়। মোঃ রাসেলের মাসিক নিট আয় ৫০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায়।

মিল্কিং মেশিন ব্যবহারের ফলে দোহন প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুমুক্ত। ম্যাস্টাইটিসের ঝুঁকি কমে যাওয়ায় গাভির স্বাস্থ্য এখন চমৎকার। শুধু দুধ বিক্রি নয়, রাসেল এখন নিজের খামারে দই ও ঘি উৎপাদন শুরু করেছেন। গ্রুপ মিটিংয়ে তিনি অন্য খামারিদের যান্ত্রিক দোহন ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনাই উৎসাহ দেন। তিনি বলেন,

> "মিল্কিং মেশিন শুধু সময় আর শ্রমিকই বাঁচায়নি, আমার গাভিগুলোকে রোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এখন আমি নিজেই সাইলেজ তৈরি করি, যা খাদ্যের খরচ অনেক কমিয়ে দিয়েছে।"

রাসেলের স্বপ্ন এখন আকাশছোঁয়া। তিনি তার খামারকে এমন এক পর্যায়ে নিতে চান যেখানে প্রতিদিন ১০০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হবে। তিনি একটি আধুনিক প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন, যেখান থেকে পনির, মাঠা ও মিষ্টি সরবরাহ করা হবে। আসলে তার এই অগ্রযাত্রা প্রমাণ করে যে, সঠিক প্রশিক্ষণ আর আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটলে বাংলাদেশের ডেইরি খাত তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা হতে পারে।

ভেড়ার খামার : আত্মনির্ভরতার জয়যাত্রা

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মাটিকাটা ইউনিয়ন। পাশ দিয়ে বয়ে চলা প্রমত্তা পদ্মা এখানকার মানুষের জীবনে যেমন আশীর্বাদ, তেমনি নদীভাঙন এক অভিশাপ। এক জীবনে কতবার যে ঘর হারিয়েছেন ফরিদা বেগম, তার হিসেব নেই। স্বামী দিনমজুর, পাঁচজনের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়- এমন এক অনিশ্চিত জীবনে ফরিদা বেগম দেখেছিলেন স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন। সংসারের চাকা ঘোরাতে ফরিদা কিছু ভেড়া কিনে পালন শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান না থাকায় পদে পদে বিপদে পড়তেন। রোগবালাই হলে কী করতে হবে, কোন খাবার দিলে ভেড়া দ্রুত বাড়বে- এসব কিছুই ছিল তার অজানা। চোখের সামনে ভেড়া অসুস্থ হয়ে মারা যেত। লোকসান আর ঋণের চাপে যখন ফরিদা দিশাহারা, তখনই তার জীবনে আশার আলো হয়ে এল এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্প।

আজ সেই সর্বহারা ফরিদা কেবল একজন গৃহবধূ নন, তিনি সাহাব্দীপুর গ্রামের এক সফল নারী উদ্যোক্তা।

ফরিদা বেগম এলডিডিপি প্রকল্পের 'সাহাব্দীপুর ভেড়া প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি)'-তে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রশিক্ষণ নেন ভেড়া পালন, টিকাদান, সাইলেজ প্রস্তুত ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার ওপর। শুধু জ্ঞানই নয়, প্রকল্প থেকে পেলেন উন্নত জাতের ভেড়া, ঘাসের বীজ আর প্রয়োজনীয় ঔষধ। পিজি'র সঞ্চয় তহবিল থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি তার খামারকে বড় করার সাহস পেলেন। এলডিডিপি প্রকল্পের ছোঁয়ায় ফরিদার খামারে আসলো খুশির জোয়ার। শূন্য থেকে শুরু করা খামারে এখন ২৫টি ভেড়া, যার প্রতিটিই সুস্থ ও সবল। আগে যেখানে তার মাসিক আয় ছিল মাত্র ৩-৪ হাজার টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৪ হাজার টাকা। ভেড়া বিক্রির টাকায় তিনি এনজিও থেকে নেওয়া ১৫ হাজার টাকার ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করেছেন। নিয়মিত টিকাদান ও পরিচ্ছন্নতার ফলে তার খামারে এখন ভেড়া মৃত্যুর হার নেই বললেই চলে। ফরিদা বেগম বলেন,

> "আগে ভেড়া অসুস্থ হলে মারা যেত, বুঝতাম না কী করব। এলডিডিপি আমাকে নিয়ম শিখিয়ে স্বাবলম্বী করেছে। এখন আমি শুধু গৃহবধূ নই, আমি একজন উপার্জনক্ষম খামারি।"

ফরিদার এই সাফল্য কেবল তার পরিবারে সচ্ছলতা আনেনি, সমাজে তার মর্যাদাও বাড়িয়েছে। একসময় যার কথায় কেউ তেমন গুরুত্ব দিত না, এখন গ্রামের অন্য নারীরা তার কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। পিজির মিটিংয়ে তিনি এখন বলিষ্ঠভাবে মতামত দেন। তার প্রভাবে এলাকার বাজারে এখন ভেড়ার দুধ ও বাচ্চার চাহিদা বেড়েছে। ফরিদা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পুঁজি কম হলেও সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে ভেড়া পালনের মাধ্যমেও দারিদ্র্যকে জয় করা সম্ভব। ফরিদা বেগম তার খামারে ভেড়ার সংখ্যা আরও বাড়াতে চান এবং নিজস্ব জমিতে পর্যাপ্ত ঘাস চাষ করতে চান। তিনি চান তার খামারটি হবে এলাকার সবচেয়ে বড় উন্নত জাতের ভেড়া উৎপাদন কেন্দ্র। পদ্মার ভাঙন হয়তো তার ঘর কেড়েছিল, কিন্তু তার মনের সাহস আর এলডিডিপি'র কারিগরি সহায়তা তাকে আজ এক অটুট ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

শেখ দই ঘর : ফেরিওয়ালা থেকে ব্যবসায়ী

মঙ্গাপীড়িত ও নদীভাঙন প্রবণ জেলা হিসেবে গাইবান্ধার একসময় যে পরিচিতি ছিল, আজ তা বদলে যাচ্ছে সাদা বিপ্লবে। আর এই বিপ্লবের অগ্রসেনানী সাদুল্লাপুরের দুই ভাই- জরিফ শেখ ও মোস্তফা শেখ। ২০০৪ সালে একটি মাত্র গাভি নিয়ে শুরু করা সেই ছোট উদ্যোগ আজ একটি বিশাল ডেইরি হাবে পরিণত হয়েছে, যা কেবল নিজেদের ভাগ্য নয়, বরং উত্তরবঙ্গের ৭,০০০ খামারির জীবন বদলে দিয়েছে। শুরুর দিকে দুই ভাই পালাক্রমে গাভির যত্ন নিতেন। বাজারে দুধের ন্যায্য দাম না পেয়ে তারা হাল ছাড়েননি। বাইসাইকেলে করে শহরে শহরে গিয়ে মানুষের দুয়ারে দুধ পৌঁছে দিতেন। গুণগত মান ভালো হওয়ায় গ্রাহক বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে সংগৃহীত দুধের পরিমাণও। একসময় বাইসাইকেল থেকে মোটরসাইকেল, আর এরপর ভ্যান থেকে শুরু হলো বড় গাড়িতে দুধ সরবরাহ। ২০০৭ সালে 'কেয়ার বাংলাদেশ' থেকে সম্মাননা পাওয়ার মাধ্যমে তাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগটি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়।

২০১২ সালে তারা ছোট পরিসরে মিষ্টির দোকান শুরু করেন। তবে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় আসে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (LDDP) সাথে যুক্ত হওয়ার পর। শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে টানা কয়েক বছর প্রথম স্থান অধিকার করার পর ২০২৩ সালে তারা 'ডেইরি আইকন' হিসেবে নির্বাচিত হন। এলডিডিপি প্রকল্প থেকে তারা প্রায় ২ কোটি ৬১ লাখ টাকা অনুদান পান, একটি অত্যাধুনিক ডেইরি হাব এবং ২০টি ভিএমসিসি (Village Milk Collection Center) স্থাপনের জন্য। বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রংপুর ও গাইবান্ধার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২০টি কালেকশন সেন্টার চালু রয়েছে। ১০০টি ইজি বাইকের মাধ্যমে খামারিদের ঘরের দুয়ার থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয়। ২৬০০ খামারি থেকে তাদের সদস্য সংখ্যা এখন ৭ হাজারে উন্নীত হয়েছে। প্রতিদিন সংগৃহীত ৩২ হাজার লিটার দুধ দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান, যেমন : মিল্ক ভিটা, প্রাণ, আড়ং ডেইরিতে সরবরাহ করা হয়। জরিফ শেখের ভাষায়,

> "গ্রামের ছোট ছোট খামারিরা আমার প্রাণ। তারা টিকে আছে বলেই আজ আমি সফল। খামারিদের ঘরের দুয়ারে গিয়ে সেবা পৌঁছানোই আমাদের সাফল্যের মূল মন্ত্র।"

জরিফ শেখ কেবল দুধ কেনেন না, বরং খামারিদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে কাজ করেন। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে খামারিদের ঔষধ সরবরাহ করেন এবং গবাদি পশুর সুচিকিৎসায় সহায়তা করেন। এই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই কোনো চুক্তি ছাড়াই হাজার হাজার খামারি তাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন। বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠানে ৩৫০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সাদুল্লাপুরের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য উপজেলাতেও আরও ৫টি অত্যাধুনিক শোরুম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের, যেখানে কেবল মানসম্মত দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করা হবে। জরিফ ও মোস্তফা শেখের এই 'শেখ দই ঘর' আজ কেবল একটি মিষ্টির দোকান নয়, এটি কয়েক হাজার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির এক মাইলফলক।

একজন স্বনির্ভর খামারি : মেঘনা তীরের জয়িতা

মেঘনা নদীর রূপ যেমন সুন্দর, তার ভাঙন ঠিক তেমনই নিষ্ঠুর। সেই মেঘনার তীরেই গোপালপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রাম। নদীভাঙন আর দারিদ্র যেখানে নিত্যসঙ্গী, সেখানেই তিন সন্তান আর কর্মহীন স্বামীকে নিয়ে বাস আমেনা বেগমের। অভাবের কষাঘাতে যখন পিঠ ঠেকে গিয়েছিল দেয়ালে, ঠিক তখনই ঘুরে দাঁড়ানোর এক দুঃসাহসী স্বপ্ন বোনেন তিনি। অন্যের কাছ থেকে ধার করা সামান্য পুঁজিতে শুরু করেন মুরগি পালন। কিন্তু তখনো আমেনা জানতেন না, কেবল খাবার দিলেই মুরগি ডিম দেয় না– তার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান।

শুরুতে আমেনার ধারণা ছিল খুবই সাধারণ। তিনি মনে করতেন, মুরগি পালন মানেই কেবল দানা ছিটিয়ে দেওয়া। জাত নির্বাচন, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন কিংবা টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা ছিল তার অজানাই। অভিজ্ঞতাহীনতার সেই তিক্ত স্বাদ পেতে দেরি হয়নি। মুরগির বৃদ্ধি থমকে গেল, ডিমের উৎপাদন কমে গেল এবং একসময় মরণঘাতী বার্ড ফ্লু কেড়ে নিল তার সবকটি মুরগি। ঋণের বোঝা আর সম্বল হারানোর যন্ত্রণায় আমেনা বেগম যখন দিশাহারা, ঠিক তখনই তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এল 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (LDDP)।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলোর রেখা হয়ে আমেনা যুক্ত হলেন প্রকল্পের প্রডিউসার গ্রুপে। সেখান থেকে তিনি লাভ করেন আধুনিক মুরগি পালনের এক নিবিড় দিকনির্দেশনা। হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে উর্বর ডিম চেনা, ব্রুডিং পদ্ধতি, আলোক ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক টিকাদান সময়সূচি– সবকিছুই তিনি আয়ত্ত করলেন নিপুণভাবে। শুধু জ্ঞানই নয়, প্রকল্প থেকে তাকে মুরগির ঘর, উন্নতমানের খাদ্য ও আধুনিক সরঞ্জাম সহায়তা দেওয়া হয়। একসময়ের দিশাহারা আমেনা হয়ে উঠলেন একজন আত্মবিশ্বাসী কারিগর।

প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমেনা আর পেছনে ফিরে তাকাননি। প্রকল্পের সহায়তায় তিনি ১০০০টি মুরগি নিয়ে নতুন উদ্যমে খামার শুরু করেন। যেখানে আগে ৬০০ মুরগি পালন করতে গিয়েই তিনি হিমশিম খেতেন, এখন সেখানে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন ৮০০ থেকে ৮৫০টি ডিম পাচ্ছেন। প্রতি মাসে সব খরচ বাদ দিয়ে তার নিট মুনাফা থাকছে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। সম্প্রতি তিনি তার খামারের পুরনো মুরগিগুলো ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন এবং নতুন করে আরও ১২০০ মুরগি যুক্ত করেছেন। আমেনার আশা, নতুন এই দফার উৎপাদন শুরু হলে তার মাসিক আয় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে। উপার্জিত এই অর্থ দিয়ে তিনি কেবল ঋণের বোঝাই নামাননি, বরং সংসারের হাল ধরেছেন শক্ত হাতে। মুরগির পাশাপাশি এখন তার খামারে ডানা ঝাপটায় ৫০টি হাঁসও, যা থেকে প্রতিদিন পাওয়া যায় বাড়তি ২০টি ডিম।

আমেনা বেগমের এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে একসময় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সমাজ আজ তাকে সম্মানের চোখে দেখে। একসময়কার কর্মহীন স্বামী আনিসুর রহমান এখন গর্বের সাথে আমেনার খামারে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন। আমেনা এখন কেবল একজন খামারি নন, তিনি পুরো গ্রামের 'প্রশিক্ষক'। গ্রামের অন্য নারীরা তার কাছে পরামর্শ নিতে এলে তিনি হাসিমুখে শিখিয়ে দেন কীভাবে ঘর পরিষ্কার রাখতে হয়, কীভাবে জালের বেড়া দিয়ে শিকারি প্রাণী থেকে মুরগি রক্ষা করতে হয় কিংবা লিটার (মেঝের বিছানা) ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কী। আমেনা বেগম বলেন,

> "আগে তো মুরগি পালনের কিছুই জানতাম না, তাই লোকসান গুণতে হইছে। এখন ভ্যাকসিন আর রোগবালাই সম্পর্কে জানি। আমার এই খামারই এখন আমার সংসার চালায়।"

আমেনা বেগম রাতারাতি আকাশছোঁয়া স্বপ্ন দেখতে চান না। তিনি নিজের সামর্থ্য বুঝে ধীরে ধীরে খামারের পরিধি বাড়াতে আগ্রহী। তার এই ধীরস্থির এবং পরিকল্পিত পথচলাই তাকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। মেঘনার ভাঙনে যার ঘর নড়বড়ে ছিল, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের ছোঁয়ায় আজ তার জীবনের ভিত্তি হয়েছে সুদৃঢ় ও স্বনির্ভর।

গরুর খামারে নতুন সূর্য

বাংলার ঘরে ঘরে কোরবানির ঈদ মানেই এক অন্যরকম আনন্দ, আর সেই আনন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ কোরবানির পশু। নোয়াখালী জেলার অমরপুর গ্রামের মোঃ কবির হোসেনও প্রতিবছর ঈদকে সামনে রেখে পশু পালন করতেন। কিন্তু হাড়ভাঙা খাটুনি আর চিরাচরিত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করায় তার কপালে জুটত কেবল লোকসান। আজ সেই কবির হোসেন এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের জাদুকরী স্পর্শে কেবল একজন সফল খামারিই নন, বরং এলাকার শত শত তরুণের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবির হোসেন আগে মনে করতেন, গরু পালন মানেই মাঠের ঘাস আর সামান্য খৈল-ভুষি খাওয়ানো। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে গরু মোটাতাজাকরণ করা যায়, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে পালন করার পরও গরুগুলো আশানুরূপ পুষ্ট হতো না। বাজারের পাইকাররা কম দাম হাঁকাতেন, আর বাধ্য হয়ে লোকসানে গরু বিক্রি করতে হতো কবিরকে। নিরাশার এই কালো মেঘ যখন কবিরের সংসারকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, ঠিক তখনই ২০২১ সালে তার জীবনে আশার আলো হয়ে আসে 'চাপরাশিরহাট হৃষ্টপুষ্টকরণ পিজি (Producer Group)'। এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় পিজিতে যোগদানের পর কবির হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে যায়। তিনি অংশ নেন আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ক নিবিড় প্রশিক্ষণে। সেখানে তিনি শিখলেন উন্নত বাসস্থান তৈরি, প্রোটিন সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং সময়মতো কৃমিনাশক ও টিকা প্রদানের গুরুত্ব। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, প্রকল্প থেকে তাকে দেওয়া হলো আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ফ্লোর ব্রাশ, ম্যাট, ট্রলি, পানির পাম্প এবং ঘাস কাটার 'চপার মেশিন' পাওয়ার পর কবিরের খামারের চিত্রটি পাল্টে গেল। গ্রাস চপার মেশিন ব্যবহারের ফলে ঘাসের অপচয় যেমন কমল, তেমনি বেঁচে গেল শ্রম ও সময়।

কবির হোসেন এখন কোরবানির হাটকে লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গরু পালন করেন। তার এই আধুনিক ব্যবস্থাপনার সুফলগুলো ছিল চোখে পড়ার মতো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের ফলে তার পারিবারিক আয় আগের তুলনায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষম খাদ্য আর নিয়মিত ভ্যাকসিনেশনের ফলে গরুগুলো এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মাংসল ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যসম্মত শেড ও নিয়মিত তদারকির ফলে খামারে পশুর মৃত্যুর হার এখন শূন্যের কোঠায়। কবির হোসেনের এই অভাবনীয় অর্থনৈতিক মুক্তি এলাকার অন্যান্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। তিনি এখন গ্রামের উঠান বৈঠকগুলোতে একজন 'মাস্টার ট্রেইনার'-এর মতো ভূমিকা পালন করেন। তিনি অন্য খামারিদের শেখান- কীভাবে অল্প পুঁজিতে ও কম সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। তিনি তাদের বোঝান যে, গরু মোটাতাজাকরণ কেবল একটি ব্যবসা নয়, এটি দেশের আমিষের ঘাটতি পূরণের এক মহৎ কাজ। কবির হোসেন বলেন,

> "আগে গরুর রোগ হলে বুঝতে পারতাম না, লোকসান হতো। এখন এলডিডিপি'র ট্রেনিংয়ের কারণে আমি পশুর খাদ্যের ধরন ও রোগের লক্ষণ সহজেই বুঝি। উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালের পরামর্শ এখন আমাদের হাতের নাগালে।"

কবির হোসেনের স্বপ্ন এখন আকাশছোঁয়া। তিনি ভবিষ্যতে তার খামারটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ডেইরি ও মিট ফার্মে রূপান্তর করতে চান। স্থানীয় বাজারের গণ্ডি পেরিয়ে তার লক্ষ্য এখন দেশের বড় বড় শহরের বাজারে উন্নতমানের মাংস সরবরাহ করা। কবির হোসেন বলেন, সঠিক প্রশিক্ষণ আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে গরুপালন হয়ে উঠতে পারে সম্মানজনক ও লাভজনক একটি পেশা।

রিক্ত হাতে পূর্ণতার জয়গান

বিদেশের তপ্ত মরুভূমিতে ভাগ্যের অন্বেষণে গিয়েছিলেন চাটখিলের আমজাদ হোসেন। কিন্তু প্রবাস জীবন তাকে দুহাত ভরে কিছু দিতে পারেনি। শূন্য হাতে দেশে ফিরে যখন ভবিষ্যতের চিন্তায় দিশাহারা, তখন নিজের মাটির ঘ্রাণেই স্বপ্নের বীজ বুনতে চাইলেন। শুরু করলেন ডেইরি খামার। কিন্তু সেই স্বপ্নযাত্রার শুরুটা ছিল কণ্টকাকীর্ণ। পদে পদে লোকসান আর অভিজ্ঞতার অভাবে খামারটি যখন বিরান ভূমিতে পরিণত হলো, তখন আমজাদ হোসেনের সামনে ছিল কেবলই ঘন অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকার ভেদ করে আজ তিনি নোয়াখালীর একজন সফল ও প্রতিষ্ঠিত খামারি।

প্রবাস থেকে ফিরে ৬টি গরু ও বাছুর নিয়ে আমজাদ হোসেন খামার শুরু করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আধুনিক জ্ঞান ও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব ছিল প্রকট। রোগের প্রাদুর্ভাবে একের পর এক গরু মারা যেতে লাগল। পকেটের পুঁজি আর মনের সাহস- দুটোই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। একটা সময় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, লোকসান সইতে না পেরে তিনি সব গরু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। যে খামার একদিন স্বপ্নে ভরপুর ছিল, তা হয়ে গেল জনশূন্য এক খাঁ খাঁ প্রান্তর। পরিবারের ভরণপোষণ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আমজাদ তখন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। হতাশার সেই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমজাদ হোসেন দেখা পেলেন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের। এটি ছিল তার জীবনের দ্বিতীয় সুযোগ। প্রকল্পের আওতায় তিনি আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, সুষম খাদ্য তৈরি, সময়মতো টিকাদান এবং রোগ প্রতিরোধের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিয়মিত তদারকি আর বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ তার ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাসকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। আমজাদ বুঝতে পারলেন, ডেইরি খামার মানে কেবল গরু লালন-পালন নয়, এটি একটি বিজ্ঞান ও সুপরিকল্পিত ব্যবসা।

প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমজাদ যখন দ্বিতীয়বার শুরু করলেন, তখন তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তার খামারে যে পরিবর্তনগুলো এল, তা ছিল বিস্ময়কর। একসময় গরুশূন্য হয়ে যাওয়া সেই খামারে এখন ২০টি গরু। আগে যেখানে দৈনিক দুধ মিলত ১০-১২ লিটার, আধুনিক পরিচর্যায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭-১৮ লিটারে। মাসিক আয় ৩০,০০০ টাকা থেকে এক লাফে বেড়ে এখন ৫০,০০০ টাকায় পৌঁছেছে। এই আয় দিয়ে তিনি কেবল তার পুরনো ঋণই শোধ করেননি, বরং পরিবারের জন্য নিশ্চিত করেছেন এক সচ্ছল ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন।

আমজাদ হোসেনের এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প আজ চাটখিলের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয়। তাকে দেখে স্থানীয় যুবকরা এখন প্রবাসের মায়া ত্যাগ করে ডেইরি খামারে আগ্রহী হচ্ছে। তিনি এখন এলাকার একজন অঘোষিত মেন্টর। খামারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা, দুধ বাড়ানোর জন্য সুষম খাদ্যের ফর্মুলা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সঠিক পদ্ধতি নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত পরামর্শ দেন অন্য খামারিদের। স্থানীয় রেস্তোরাঁ ও বাজারে আমজাদ হোসেনের খামারের দুধের এখন ব্যাপক চাহিদা। আমজাদ হোসেন তৃপ্তির হাসি হেসে বলেন,

> “এলডিডিপি প্রকল্প আমাকে শুধু প্রশিক্ষণ দেয়নি, আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। খামার শূন্য হয়ে যাওয়ার সেই দিনগুলো এখন অতীত। এখন আমার স্বপ্ন- এই খামারটিকে জেলার একটি আদর্শ খামারে পরিণত করা।”

আমজাদ হোসেন এখানেই থেমে থাকতে চান না। তিনি তার খামারকে আরও টেকসই ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করতে চান। অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একটি আদর্শ ডেইরি মডেল তৈরি করাই এখন তার মূল লক্ষ্য। আমজাদ হোসেনের পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির গল্প প্রমাণ করেছে সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে ব্যর্থতার ছাই থেকেও সাফল্যের ফিনিক্স পাখি হয়ে ওড়া সম্ভব।

আফরোজা খাতুন : স্বপ্ন থেকে সফলতা

রাজশাহী জেলার বামনকায়া গ্রাম। বিল দিয়ে ঘেরা এই জনপদে আফরোজা খাতুনের সংসার ছিল অভাবের এক দীর্ঘ সুর। স্বামী বেকার, সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত- এমন এক কঠিন সময়ে আফরোজার সম্বল ছিল উঠোনের কয়েকটি কঙ্কালসার গাভি। কিন্তু দুধ বিক্রির সেই যৎসামান্য অর্থে সংসার চালানোই যেখানে অসম্ভব ছিল, সেখানে খামার চালানো ছিল এক বিলাসিতা। তবে আফরোজা হার মানেননি। তিনি নিজের ভাগ্য বদলাতে চেয়েছিলেন নিজ হাতেই। আজ সেই আফরোজা শুধু একজন সফল খামারি নন, বরং উত্তরবঙ্গের এক উদীয়মান 'ডেইরি লিডার'।

আগে প্রতিদিন ২০-৩০ লিটার দুধ বিক্রি করে আফরোজার মাসে আয় হতো মাত্র ৮-১০ হাজার টাকা। এই আয়ে সংসার চলছিল না, তাই তিনি বিকল্প পথ খুঁজতে থাকেন। ২০২৪ সালে এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের 'বামনকায়া ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি)'-এ যোগদানের পর তার সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তিনি শিখলেন দুধ শুধু তরল খাবার নয়, এটি এক বিশাল ব্যবসার উৎস। প্রশিক্ষণ নিলেন দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য তৈরি এবং আধুনিক বিপণন কৌশলের ওপর।

প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় আফরোজা কাঁচা দুধ বিক্রির গতানুগতিক ধারা ভেঙে শুরু করলেন প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন। এরপর তার খামারে আসে বিপুল পরিবর্তন। যেখানে আগে ৩০ লিটার দুধ বিক্রি হতো, এখন প্রতিদিন ২৫০-৩০০ লিটার দুধ ব্যবহার করে ঘি, মাঠা ও চিজ তৈরি করছেন তিনি। তিনি বুঝতে পেরেছেন দুধের চেয়ে দুগ্ধজাত পণ্যের মুনাফা বেশি। বিশেষ করে তার তৈরি চিজ বা পনির এবং সুগন্ধি ঘি স্থানীয় বাজারে এক আস্থার ব্র্যান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে তিনি চিজ ও মাঠা আকর্ষণীয়ভাবে মোড়কজাত করে বাজারে ছাড়ছেন, যা তাকে একজন আধুনিক উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। আফরোজা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন,

> "দৃঢ় মনোবল আর এলডিডিপি'র প্রশিক্ষণ আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। এখন আমি শুধু নিজে উপার্জন করি না, এলাকার নারীদেরও যথাসম্ভব পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি।"

আফরোজা আজ একা নন। তার এই বিশাল কর্মযজ্ঞে তিনি স্থানীয় অনেক বেকার নারীকে সম্পৃক্ত করেছেন, তৈরি করেছেন নতুন কর্মসংস্থান। তার এই অভাবনীয় সাফল্যে বিল পাড়ের অন্য নারীরাও এখন দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে আগ্রহী হচ্ছেন। পিজি'র নিয়মিত সভায় তিনি তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, যা পুরো এলাকার খামারিদের মধ্যে এক বাণিজ্যিক সচেতনতা তৈরি করেছে। তিনি ভবিষ্যতে নিজস্ব ব্র্যান্ডের প্যাকেটজাত চিজ ও মাঠা বড় শহরগুলোতে বাজারজাত করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, দুধের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনই হতে পারে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে টেকসই উপায়।

খামারি মাজকুরা বেগম : বিবর্তনের কারিগর

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বিদিরপুর গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাঁটলে কানে আসে এক ঝাঁক ছাগলের ডাক। এটি কেবল কোনো খামারের শব্দ নয়, এটি একজন গৃহবধূর ঘুরে দাঁড়ানোর চিহ্ন। স্বামীর স্বল্প আয়ে সন্তানদের লেখাপড়া আর সংসারের চাকা যখন অচল হয়ে আসছিল, তখন অন্ধকার ঘরে আশার প্রদীপ জ্বেলেছিলেন মাজকুরা বেগম। একসময়ের দিশাহারা এই নারী আজ নিজের সংসারের হাল ধরেছেন। শুরুটা ছিল মাত্র ৪টি ছাগল নিয়ে। মাজকুরা ভেবেছিলেন ছাগল পালন সহজ, কিন্তু বাস্তবতা ছিল কঠিন। আধুনিক প্রযুক্তি আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা না থাকায় ছাগলগুলো প্রায়ই রোগে আক্রান্ত হতো। চিকিৎসার পেছনেই বেরিয়ে যেত আয়ের সিংহভাগ। সঠিক পুষ্টির অভাবে ছাগলের বৃদ্ধি থমকে যেত, আর মড়ক লাগলে সব শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় তাড়া করত। হতাশা যখন তাকে গ্রাস করছিল, মাজকুরা তখন বুঝতে পারলেন যে পরিশ্রমের সাথে সঠিক জ্ঞানের সমন্বয় না হলে এই লড়াইয়ে জেতা সম্ভব নয়।

মাজকুরা বেগমের এই ক্লান্ত জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এল 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (LDDP)। তিনি হরিপুর ছাগল প্রডিউসার গ্রুপের (PG) সদস্য নির্বাচিত হলেন। প্রকল্পের আওতায় তিনি আধুনিক ছাগল পালন পদ্ধতি, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং সময়মতো টিকাদানের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। শুধু জ্ঞানই নয়, প্রকল্প থেকে তাকে দেওয়া হলো 'ক্লাইমেট-স্মার্ট' আধুনিক শেড, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য সহায়তা। এই সহায়তা মাজকুরাকে একজন গৃহিণী থেকে দক্ষ উদ্যোক্তায় রূপান্তর করল। নতুন উদ্যমে শুরু করা মাজকুরার খামারে এখন আর হতাশার কোনো চিহ্ন নেই। প্রকল্পের আধুনিক শেডের কারণে ছাগলগুলোর প্রজনন ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় তার মাসিক আয় আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। খামারের আয় দিয়ে তিনি পুরনো ঋণ শোধ করেছেন এবং নিয়মিত সঞ্চয় করছেন। আজ মাজকুরার সন্তানদের পড়ালেখা আর টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে থাকে না; বরং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে এই খামারের আয় থেকেই। মাজকুরা তার খামারে ছাগলের সংখ্যা ৩৫-এ উন্নীত করতে চান। তার পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক খামারটি একদিন জেলার একটি মডেল খামারে পরিণত হবে, এই বিশ্বাস এখন তার চোখেমুখে।

বিদিরপুর গ্রামের মাজকুরা আজ কেবল একজন সফল খামারি নন, তিনি প্রতিকূলতাকে জয় করে গড়ে ওঠা এক অপরাজেয় নারী শক্তির প্রতীক। ইচ্ছা থাকলে একজন নারীও পারেন সমাজের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে, তারই উজ্জ্বল উদাহরণ মাজকুরা বেগম। তিনি এখন আর কেবল নিজের খামার সামলান না, বরং পিজির মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং বাজারের ওঠানামা মোকাবিলায় ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরিতে নেতৃত্ব দেন। মাজকুরা তাদের শেখান–কখন টিকা দিতে হয়, কীভাবে শেড পরিষ্কার রাখতে হয় আর আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কী। মাজকুরা বেগম আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন,

> “এলডিডিপি প্রকল্প আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কাজ করে খাওয়া অনেক সম্মানের। অনেক কষ্ট করে আজ সংসারে সচ্ছলতা এনেছি।”

সবুজের বিপ্লবে বেকারত্ব দূরীকরণ

শ্রীমঙ্গল মানেই চায়ের দেশ, সবুজের সমারোহ। কিন্তু সেই সবুজের মাঝে শ্যামল হোসেন নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একের পর এক ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে যখন সিলেটের চিরচেনা প্রথা অনুযায়ী 'বিদেশ' যাওয়ার টিকিট কাটার প্রহর গুনছিলেন, ঠিক তখনই এক চিলতে ঘাস তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আজ শ্যামল কেবল একজন খামারি নন, তিনি শ্রীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান 'ঘাস ব্যবসায়ী'।

শ্যামল যখন বিদেশের ভিসার জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষায় দিন পার করছিলেন, তখন তার গ্রাম উত্তর ভাড়াউড়ায় এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের একটি প্রডিউসার গ্রুপ গঠিত হয়। বেকার শ্যামল দূর থেকে দেখতেন পিজি'র সদস্যরা আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তারও প্রবল ইচ্ছা ছিল যোগ দেওয়ার, কিন্তু পিজিতে তখন জায়গা খালি নেই। দমে যাননি শ্যামল। তিনি নিয়মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। অবশেষে পিজি'র সদস্য সংখ্যা যখন বাড়ানো হলো, শ্যামলের জন্য খুলে গেল এক সম্ভাবনার দুয়ার। শ্যামল দেখলেন, শ্রীমঙ্গল তথা সিলেট অঞ্চলে খামারিদের সবচেয়ে বড় সমস্যা 'ঘাসের অভাব'। অধিকাংশ খামারি ঘাস না পেয়ে দামি দানাদার খাদ্যের ওপর নির্ভর করেন, ফলে লোকসান গুণে খামার বন্ধ করে দেন। এই 'গ্যাপ' বা শূন্যস্থানটিই ছিল শ্যামলের ব্যবসার মূল সুযোগ। এলডিডিপির প্রশিক্ষণ থেকে তিনি শিখলেন উন্নত জাতের ঘাস চাষের কলাকৌশল। নিজের ১২ বিঘা জমিতে শুরু করলেন জার্মান, নেপিয়ার ও পাকচুং ঘাসের চাষ।

শ্যামল এখন আর বিদেশের মরুর বুকে ঘাম ঝরানোর স্বপ্ন দেখেন না। তার দিন কাটে নিজের ঘাসের সবুজ চাদরে। তিনি নিজেই চারা রোপণ করেন, নিড়ানি দেন এবং আঁটি বেঁধে খামারিদের কাছে ঘাস সরবরাহ করেন। শুধু ঘাস বিক্রি করেই বছরে তার আয় এখন প্রায় ১ লাখ টাকা। এর পাশাপাশি নিজের গাভি ও মহিষের দুধ থেকে বছরে আরও ৭৫ হাজার টাকা আয় করছেন। শ্রীমঙ্গল শহরে বা আশপাশে কেউ আগে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঘাস বিক্রি করত না। শ্যামল ছোট ছোট আঁটি বেঁধে ঘাস সরবরাহ করেন, যা খামারিদের জন্য বহনযোগ্য ও সুবিধাজনক। শ্যামল তার ঘাসের জমিতে নিজের খামারের গোবর সার ব্যবহার করেন, যা মাটির উর্বরতা বাড়ায় এবং খরচ কমায়। তার পরিকল্পনা এখন আরও আধুনিক। তিনি গরুর দুধ উৎপাদন বাড়াতে 'ভুট্টার সাইলেজ' তৈরি করতে চান এবং খামারে আরও তিনটি উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান গাভি যুক্ত করার স্বপ্ন দেখছেন। শ্যামল তার ভাষায় বলেন,

> "বহুত মানুষ তারার গরুর লাগি উন্নত ঘাস না পাইয়া ইতা লোকাল ঘাস খাওয়াইন। এর লাগি তারা দানাদার খানি বেশি খাওয়াইন আর গরু-এ খুব বেশি দুধ দেইন না। এর ফর থাকি আমি ব্যবসার লাগি ঘাস চাষর কথা চিন্তা করি।"

হতাশার মেঘ চিরে : ফিড মিলের কল্যাণে খামারির অগ্রযাত্রা

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া গ্রাম। চারদিকে ফসলের মাঠ আর খামারিদের ব্যস্ততা থাকলেও মোস্তাকিম চৌধুরীর দিনগুলো কাটছিল গভীর দুশ্চিন্তায়। ডেইরি খামার থাকলেও পশুখাদ্যের উচ্চমূল্য আর নিম্নমানের কারণে উৎপাদন খরচ মিটিয়ে লাভের মুখ দেখা ছিল প্রায় অসম্ভব। আজ সেই মোস্তাকিমই এলাকার খামারিদের কাছে 'খাদ্য নিরাপত্তার' এক আস্থার নাম। এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের ম্যাচিং গ্রান্টসের মাধ্যমে স্থাপিত 'ফিড মিল' আজ তার খামারে এনেছে জাদুর মতো পরিবর্তন।

মোস্তাকিমের খামারে এক সময় প্রতিদিন ৪৫০-৫০০ লিটার দুধ উৎপাদন হতো। কিন্তু পশুকে যে দানাদার খাবার খাওয়ানো হতো, তার ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বাজারের খাবারের আকাশছোঁয়া দাম, ভেজাল মিশ্রণ আর সময়মতো সরবরাহের অভাবে পশুর স্বাস্থ্য ও দুধ উৎপাদন–দুটোই বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। উৎপাদন কম আর খরচ বেশি হওয়ায় খামারটি টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে পড়েছিল। এমন সময় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সঠিক দিকনির্দেশনায় মোস্তাকিম এলডিডিপি প্রকল্পের 'ম্যাচিং গ্রান্টস' কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের খামারে একটি আধুনিক ফিড মিল স্থাপন করেন। এই একটি প্রযুক্তির সংযোজন তার খামার ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনে। এখন তিনি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত কাঁচামাল দিয়ে দানাদার খাদ্য তৈরি করতে পারেন, যা শতভাগ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন।

ফিড মিল স্থাপনের পর মোস্তাকিমের খামারে দুধের দৈনিক গড় উৎপাদন ৫০০ লিটার থেকে বেড়ে এখন ৫৫০-৬০০ লিটারে উন্নীত হয়েছে। বাজার থেকে চড়া দামে খাবার কেনার ঝামেলা নেই, ফলে উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পুষ্টিমান নিশ্চিত হওয়ায় গাভির স্বাস্থ্য ও প্রজনন ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। মোস্তাকিম চৌধুরী জানান,

> "আগে দানাদার খাবার কিনতে হতো, সময়মতো পাওয়া যেত না, পেলেও মান ভালো থাকত না। এখন নিজেই মিক্সিং করি, গুণগত মান ঠিক থাকে আর খরচও কমেছে। এলডিডিপি আমাকে নতুন দিশা দেখিয়েছে।"

মোস্তাকিম কেবল নিজের খামার নিয়েই ভাবেননি। তার এই ফিড মিলের সুফল পাচ্ছেন আশেপাশের ক্ষুদ্র খামারিরাও। তিনি স্থানীয় খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর ফিড সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করছেন। এর ফলে এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র খামারিরা মানসম্মত ফিড পাওয়ায় নতুন করে খামার পরিচালনায় আগ্রহী হচ্ছেন। স্থানীয় বাজারে তার তৈরি ফিডের প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। মোস্তাকিমের পরবর্তী লক্ষ্য এলাকার ক্ষুদ্র খামারিদের নিয়ে একটি 'সমবায় গ্রুপ' গঠন করা। এর মাধ্যমে তিনি বাণিজ্যিকভাবে দানাদার খাদ্যের উৎপাদন আরও বাড়াতে চান এবং পুরো এলাকার ডেইরি খাতকে একটি টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চান।

অদম্য পরিশ্রমে তৌহিদের ভাগ্যোন্নয়ন

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার যোগিপাড়া গ্রাম। খরাপ্রবণ এই অঞ্চলে একসময় ডেইরি খামার করা ছিল চরম চ্যালেঞ্জের। কিন্তু মোঃ তৌহিদ ইবনে হুমায়ূন প্রমাণ করেছেন যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর প্রযুক্তির সঠিক সমন্বয় থাকলে যেকোনো প্রতিকূলতা জয় করা সম্ভব। ২০১৬ সালে মাত্র ৪টি গরু নিয়ে শুরু করা তৌহিদের সেই ছোট্ট খামারটি আজ উত্তরবঙ্গের ডেইরি শিল্পের এক অনুকরণীয় মডেলে পরিণত হয়েছে। তৌহিদ এখন আর শুধু একজন খামারি নন, তিনি একজন দূরদর্শী উদ্যোক্তা। তার লক্ষ্য নিজস্ব ব্র্যান্ডের নামে প্যাকেটজাত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারে আনা।

তৌহিদের শুরুটা মোটেও মসৃণ ছিল না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আর দুধের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া ছিল নিত্যদিনের সমস্যা। আধুনিক জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় লোকসান গুণতে হতো। কিন্তু তৌহিদ দমে যাননি। তিনি জানতেন, সনাতন পদ্ধতি ছেড়ে আধুনিক রাস্তায় হাঁটলে এই শিল্পে টিকে থাকা সম্ভব। তাই, ২০২০ সালে তৌহিদ এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের 'যোগিপাড়া ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ'-এ যোগ দেন। এই প্রকল্পের আওতায় তিনি কেবল প্রশিক্ষণই পাননি, বরং তার খামারে যুক্ত হয় আধুনিক সব যন্ত্রপাতি। মোবাইল মিল্কিং মেশিন হাতে দুধ দোহনের ঝামেলা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করেছে। এতে গাভির স্বাস্থ্য ভালো থাকছে এবং সময় বেঁচে যাচ্ছে। মিল্ক ক্রিম সেপারেটর তৌহিদের আয়ের নতুন পথ খুলে দেয়। দুধ থেকে ক্রিম আলাদা করে তিনি এখন ঘি ও মাখন তৈরি করছেন, যা বাড়তি মুনাফা নিশ্চিত করছে।

এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় তৌহিদের খামারে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, তা সত্যিই অনুপ্রেরণা জোগায়। গরুর সংখ্যা ৪টি থেকে এখন মোট ২৭টি (২১টি দুগ্ধবতী) হয়েছে। গড় দুধ উৎপাদন প্রতিদিন ৩ লিটার থেকে ৯ লিটার (গাভি প্রতি) হয়েছে। মাসিক গড় আয় ১০,০০০ টাকা থেকে এখন ৫০,০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে ৭ জন মানুষের।

তৌহিদের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো ৫,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি মিল্ক চিলিং সেন্টার স্থাপন। এটি শুধু তার নিজের জন্য নয়, বরং পুরো এলাকার খামারিদের জন্য আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তিনি প্রাণ ডেইরি এবং ব্র্যাক-এর মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি কাজ করছেন। তৌহিদ বলেন,

> "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমি আধুনিক দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কৌশল শিখেছি। এখন আমার খামারে শুধু দুধ নয়, ঘি ও মাখনের মতো প্রিমিয়াম পণ্যও তৈরি হচ্ছে।"

তৌহিদ এখন নিয়মিত স্থানীয় অন্য খামারিদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিচ্ছেন, যাতে পুরো সাঘাটা অঞ্চল একটি সমৃদ্ধ ডেইরি হাবে পরিণত হয়।

উন্নয়নের ধারায় বরুণার আলোকিত শিক্ষক

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ শ্রীমঙ্গল। চা বাগানের সবুজে ঘেরা বরুণা গ্রামের এক নিভৃতচারী মাদ্রাসা শিক্ষক মোঃ আতাউল্লাহ। তিনি আজ প্রমাণ করেছেন, বইয়ের পাতার শিক্ষার সাথে যখন আধুনিক প্রযুক্তির মিলন ঘটে, তখন গ্রামীণ অর্থনীতিতে সচ্ছলতার জোয়ার আসা সুনিশ্চিত। একসময় তার খামারের দেশি গাভিগুলো ছিল কঙ্কালসার, আর গোয়ালের নোংরা পরিবেশে গরুগুলো থাকতো রোগাক্রান্ত। শিক্ষকতা থেকে প্রাপ্ত সামান্য আয় আর লোকসানি খামার নিয়ে আতাউল্লাহর দিনগুলো কাটছিল অনিশ্চয়তায়। কিন্তু এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের জ্ঞান ও প্রযুক্তির স্পর্শে আজ সেই জীর্ণ খামারই হয়ে উঠেছে এলাকার এক অনুকরণীয় 'মডেল'।

আতাউল্লাহর শুরুটা ছিল মাত্র তিনটি গরু নিয়ে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা জানা না থাকায় গোয়ালের জমাট বাঁধা গোবর আর মশার উপদ্রবে গরুগুলো সবসময় ছটফট করত। এলডিডিপি প্রকল্পের 'বরুণা ডেইরি পিজি'-তে যোগদানের পর তিনি ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি শিখলেন খামার কেবল ব্যবসা নয়, এটি একটি বিজ্ঞান। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত 'চপার মেশিন' তার পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনল। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান আতাউল্লাহর খামারে বয়ে আনল অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি। আগে যেখানে গাভি থেকে মাত্র ৬.৫ লিটার দুধ মিলত, আধুনিক পরিচর্যায় তা বেড়ে এখন ১২ লিটারে পৌঁছেছে। বর্তমানে ৯টি গরু-বাছুর নিয়ে তার খামারে প্রতিদিন ৬০ লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে। কেবল দুধ বিক্রি নয়, গ্রামের নানা অনুষ্ঠানে তিনি নিজস্ব ফর্মুলায় তৈরি দই ও মিষ্টি সরবরাহ করেন। গত এক বছরে কেবল মিষ্টি ও দই থেকেই তার অতিরিক্ত আয় হয়েছে ৫০,০০০ টাকা।

আতাউল্লাহর খামারে গরুর গোবর এখন আর দুর্গন্ধ ছড়ায় না। তিনি তৈরি করেছেন একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, যা তার পরিবারের রান্নার খরচ ও কষ্ট দুই-ই কমিয়ে দিয়েছে। এছাড়া প্ল্যান্টের উচ্ছিষ্ট সার দিয়ে তিনি নিজের জমিতে চাষ করছেন কেমিক্যালমুক্ত টাটকা সবজি। আতাউল্লাহ তার আঞ্চলিক ভাষায় তৃপ্তির সাথে বলেন, "আগে নিজের মতো করে গরু পালতাম, গোয়ালের গন্ধে থাকা দায় ছিল। ওখন আমার খামার এতো পরিষ্কার যে, চাইলে খামারেই ঘুমানো যায়! এলডিডিপি আমার খামারের সাথে ভাগ্যটাও পাল্টাইলাইছে।"

আতাউল্লাহ এখন কেবল মাদ্রাসার ছাত্রদেরই পড়ান না, গ্রামের অন্য খামারিদেরও দেন আধুনিক পশুপালনের শিক্ষা। তার সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হলো-

> "গাভিকে যদি সন্তান স্নেহে পালন করা হয়, তবে গাভিও তার প্রতিদান দেয়।"

তার সাফল্য দেখে গ্রামের আরও অনেক পরিবার এখন বাণিজ্যিকভাবে ডেইরি খামার স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছে। আতাউল্লাহ তাদের শেখান কীভাবে কৃত্রিম প্রজনন আর সঠিক টিকাদানের মাধ্যমে একটি লোকসানি খামারকে লাভজনক করা যায়। তার লক্ষ্য এখন সুনির্দিষ্ট। আগামী এক বছরের মধ্যে তিনি দৈনিক দুধের উৎপাদন ১০০ লিটারে নিয়ে যেতে চান। নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুধ ভোক্তার দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। সঠিক মূল্য, মান এবং বাজার চাহিদার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি বরুণা গ্রামকে একটি দুগ্ধ-সমৃদ্ধ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চান।

শাহিন আক্তারের প্রাপ্তি : শূন্য থেকে সমৃদ্ধি

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার আকবর পাড়া। প্রবাসীদের আধিক্য থাকলেও গ্রামীণ এই জনপদের নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল দীর্ঘকাল সীমিত। সেই সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভেঙে নিজের ভাগ্য গড়েছেন শাহিন আক্তার। একসময়ের সাধারণ এই গৃহবধূ আজ লোহাগাড়ার এক সফল নারী উদ্যোক্তা, যার হাতের ছোঁয়ায় বিষণ্ন খামার পরিণত হয়েছে এক সমৃদ্ধ ডেইরি ও হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রজেক্টে।

২০১৫ সালে জমানো সামান্য পুজি নিয়ে মাত্র ৩টি গরু দিয়ে শাহিনের পথচলা শুরু। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান না থাকায় পদে পদে হোঁচট খাচ্ছিলেন তিনি। এর মধ্যে নেমে আসে করোনার কালো ছায়া। বাজার বন্ধ, পশুর চিকিৎসা নেই, মানসিকভাবে ভেঙে পড়া শাহিন যখন সব হারানোর ভয়ে দিন গুণছিলেন, ঠিক তখনই 'ইমার্জেন্সি অ্যাকশন প্ল্যান'-এর মাধ্যমে তার পাশে দাঁড়ায় এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্প। ২০২২ সালে লোহাগাড়া গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ দলে যোগদানের পর শাহিন আক্তার একে একে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি শিখলেন যে খামার মানে শুধু গরু পালা নয়, এটি একটি ব্যবসা। কাঁচা ঘাসের বদলে তিনি শুরু করলেন ভুট্টার সাইলেজ ও ইউএমএস প্রস্তুত করা। এতে পশুর পুষ্টি বাড়ল আর দানাদার খাদ্যের খরচ কমল উল্লেখযোগ্যভাবে। ঘাস কাটার মেশিন তার হাড়ভাঙা খাটুনি কমিয়ে দিল। আর ফিড ট্রলি, ফ্লোরম্যাট ও মোটরের মতো হাইজেনিক টুলস্ ব্যবহারের ফলে তার খামার এখন হাসপাতালের মতো পরিচ্ছন্ন।

শাহিন আক্তারের খামারের বর্তমান চিত্র এক বিস্ময়কর সাফল্যের গল্প। ৩টি গরু থেকে বর্তমান গরুর সংখ্যা ১২টি (ষাঁড়, গাভি ও বাছুর মিলিয়ে)। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ৮টি ষাঁড় গরু বিক্রি করেছেন। প্রতিটি গরু থেকে তিনি ১.২ লক্ষ টাকারও বেশি দাম পেয়েছেন। কেবল গরু নয়, তিনি একই সঙ্গে ছাগল, মুরগি ও কবুতর পালন করছেন। পাশাপাশি গরুর গোবর দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে কেঁচো সার তৈরি করে অতিরিক্ত আয় করছেন। সব খরচ বাদ দিয়ে তার মাসে নিট লাভ থাকে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা। শাহিন আক্তার বলেন,

> "আমি যখন খামার শুরু করি তখন ভাবিনি আজ এই অবস্থায় আসবো। আমার সব থেকে বড় পাওয়া এই খামার করে আমি আমার ৩ ছেলে-মেয়েকে পড়ালেখা করাচ্ছি। আমি চাই আমার মেয়েরাও যেন এভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।"

শাহিন আক্তার আজ কেবল নিজের ভাগ্য বদলাননি, তিনি আকবর পাড়ার নারীদের সাহস। তাকে দেখে এলাকার অনেক নারী এখন খামার পরিচালনায় আগ্রহী হচ্ছেন। তিনি এখন আর শুধু নিজের পরামর্শদাতা নন, বরং পাড়ার নারীদের 'হাতে-কলমে শিক্ষক'। তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য গরুর সংখ্যা আরও বাড়িয়ে খামারকে বড় করা, একটি আধুনিক দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট স্থাপন করা, এবং বাণিজ্যিকভাবে বড় পরিসরে কেঁচো সার বিপণন।

গাভীর খামারে বন্ধুর পথে তিন বন্ধুর জয়যাত্রা

সিলেট শহরে আজ 'দুধওয়ালা' এক আস্থার নাম। কিন্তু এই নামের পেছনে লুকিয়ে আছে তিন তরুণের জেদ, বন্ধুত্ব আর এক বিশাল সংগ্রামের ইতিহাস। দিরাইয়ের আমজাদ হোসেন, বিয়ানীবাজারের শাকিল জামান আর সুনামগঞ্জের মোতাহার হোসেন- সিলেটে পড়তে এসে গড়ে ওঠা এই ত্রয়ীর বন্ধুত্ব আজ কেবল আড্ডায় সীমাবদ্ধ নেই, তা রূপ নিয়েছে এক সফল ব্যাবসায়িক বিপ্লবে। চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন, আজ তা সিলেটের দুগ্ধ খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ছাত্রজীবন শেষে পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে এই তিন বন্ধু মিলে গড়ে তোলেন একটি ডেইরি খামার। হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে দুধ উৎপাদন বাড়ালেও বিপত্তি ঘটল বিপণনে। বড় প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নানা অজুহাতে দুধের দাম কম দিত, পাওনা টাকা আটকে রাখত। খামারিদের এই অসহায়ত্ব দেখে তারা এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিলেন- অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই সরাসরি ভোক্তার দুয়ারে দুধ পৌঁছে দেবেন। ২০১৭ সালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ সরবরাহের সেই শুরুটা ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু তাদের সততা আর পণ্যের গুণগত মান দ্রুতই নগরবাসীর আস্থা অর্জন করে। এরপর ২০১৯ সালে দই উৎপাদন শুরু করলেও করোনার মহামারিতে বড় ধাক্কা খায় 'দুধওয়ালা'। ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প'। সুরমাগেইট দুগ্ধ উৎপাদনকারী দলের (PG) সদস্য হিসেবে তারা লাভ করেন উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ। ২০২১ সালে এলডিডিপি কর্তৃক 'ডেইরি আইকন' নির্বাচিত হওয়া ছিল তাদের জন্য এক বড় স্বীকৃতি।

সবচেয়ে বড় মাইলফলক আসে ২০২২ সালে। এলডিডিপি'র 'ম্যাচিং গ্র্যান্ট' বা বড় আকারের আর্থিক অনুদান ক্যাটাগরিতে তারা ৮৩ লক্ষ টাকা পান। এই টাকা দিয়ে তারা দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মিষ্টি তৈরির অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কেনেন। আজ 'দুধওয়ালা' কেবল একটি খামার নয়, এটি সিলেটের একটি প্রথম সারির দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান। দুধওয়ালা আজ শুধু তিন বন্ধুর সাফল্য নয়, এটি সিলেটের শত শত খামারির আস্থার আশ্রয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদিন প্রায় ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ লিটার দুধ স্থানীয় খামারিদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করে। এর ফলে আগে যারা সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি ছিল, সেই খামারিরা এখন সঠিক দাম পাচ্ছেন। ৫টি নিজস্ব শোরুম আর ১টি কারখানায় বর্তমানে প্রায় ৫০ জন কর্মীর জীবিকা সংস্থান হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে। শাকিল জামান আঞ্চলিক ভাষায় তার ক্ষোভ আর প্রাপ্তির কথা এভাবেই তুলে ধরেন,

> "খামারিরা বহুত কষ্ট করি দুধ উৎপাদন করি কিন্তু ন্যায্য মূল্য পাই না। কষ্ট করি আমরা আর ফল খাইন তারা। এর লাগি রাগে দুঃখে নিজেরাই সরাসরি বাড়িত বাড়িত ডেলিভারি শুরু করি দেই। হিসময় যদি এই রিস্ক না লইতাম, তাইলে আইজও আমরা তারার কাছে বান্ধা থাকতাম।"

মোতাহার হোসেন সোহেল স্বপ্ন দেখেন একটি বিশ্বমানের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার, যার কাজ ইতিমধ্যে বিসিকে শুরু হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো সিলেটের শিশুরা যাতে প্যাকেটজাত জুসের বদলে প্রতিদিন অন্তত ২৫০ গ্রাম খাঁটি দুধ (চকলেট বা আম ফ্লেভারের দুধ) পান করতে পারে।

'দুধওয়ালা' দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারুণ্যের শক্তি আর সরকারি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা মিললে বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে দিয়ে খামারিদের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব। সিলেটের সবুজ প্রান্তরে তিন বন্ধুর এই স্বপ্নগাথা আজ দেশের হাজারো শিক্ষিত বেকার যুবকের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস।

বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পারভিন আক্তারের উদ্যমের কাহিনি

ফরিদপুর বাইপাস রোডের এক সাধারণ পরিবারে পারভিনের জন্ম। ১২ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসা পারভিনের জীবন ছিল রূপকথার উল্টো। জুয়াড়ি স্বামী ঋণের দায়ে নিজের স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো চরম অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাবার হস্তক্ষেপে উদ্ধার পেলেও জীবনটা যেন এক মহাশূন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পারভিন আক্তার দেখিয়ে দিয়েছেন, যখন পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, তখন ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তিও ভেতর থেকেই আসে।

নিজের শেষ সম্বল একটি সোনার চেইন মাত্র ১১ হাজার টাকায় বিক্রি করে পারভিন শুরু করেন দুধের ব্যবসা। মাত্র ৫০ লিটার দুধ সংগ্রহ করে নিজে প্যাকেটজাত করতেন এবং বিআরটিসি বাসে করে ঢাকা গিয়ে ফেরি করে বিক্রি করতেন। কাকডাকা ভোরে স্কুটার চালিয়ে দোকানে দোকানে দুধ পৌঁছে দেওয়া সেই পারভিন আজ ফরিদপুরের এক অনন্য ব্র্যান্ডের মালিক।

২০২৪ সালে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (LDDP) 'ম্যাচিং গ্রান্ট' পারভিনের জীবনে জাদুর মতো পরিবর্তন আনে। প্রকল্পের সহায়তায় তিনি স্থাপন করেন একটি অত্যাধুনিক দুধ শীতলীকরণ কেন্দ্র এবং পাস্তুরাইজিং মেশিন। জন্ম নেয় তার নিজস্ব ব্র্যান্ড 'ভিলেজ মিল্ক', যা পরবর্তীতে 'ভিলেজ মিল্ক লিমিটেড' নামে নিবন্ধিত হয়। তিনি কেবল কাঁচা দুধ বিক্রিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি; ঘি, মিষ্টি দই, টক দই, লাচ্ছি ও মাখনের মতো প্রিমিয়াম পণ্য তৈরি করে বাজার জয় করেছেন। বর্তমানে তিনি মাসে ৩০০০-৪০০০ লিটার দুধ সংগ্রহ করে থাকেন। মাসিক গড় আয় দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায়। তিনি প্রায় ১০০ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছেন এবং তার উদ্যোগে কর্মরত আছেন ১৬ জন নারী ও পুরুষ।

পারভিন আজ কেবল একজন সফল ব্যবসায়ী নন, তিনি একটি শক্তিশালী 'ইকো-সিস্টেম' গড়ে তুলেছেন। তার অধীনে বর্তমানে ১১টি দুধ কালেকশন পয়েন্ট এবং ৮ হাজার লিটার ধারণক্ষমতার শীতলীকরণ কেন্দ্র রয়েছে। যখন তিনি সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পড়েছিলেন, তখন হাল না ছেড়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত তাকে আজ ফরিদপুরের 'ডেইরি আইকন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বলেন,

> "এলডিডিপি আমাকে আধুনিক পদ্ধতি শিখিয়েছে। ভবিষ্যতে আমি লাবান, মাঠা এবং চকলেট-ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের মিল্ক বাজারে আনতে চাই। আমার লক্ষ্য- আশপাশের অন্য নারীদেরও স্বাবলম্বী করে তোলা।"

পারভিনের এই জীবন-সংগ্রাম প্রমাণ করে যে, সঠিক সরকারি সহায়তা এবং অদম্য সাহস থাকলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা অসম্ভব কিছু নয়। যে পারভিনকে সমাজ একসময় করুণার চোখে দেখেছিল, আজ সেই পারভিন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন এবং হয়ে উঠেছেন শত সহস্র নারীর অনুপ্রেরণা।

তানিয়া : বর্জ্য থেকে বৈপ্লবিক বিজয়

ফরিদপুর সদর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। একসময় এই গ্রামের মানুষ যে কাজটিকে 'নোংরা' বলে উপহাস করত, আজ সেই কাজই পুরো এলাকার অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের নেপথ্যে আছেন অদম্য এক নারী- তানিয়া পারভীন। মাত্র ২০০ গ্রাম কেঁচো আর ৩টি রিং নিয়ে শুরু করা তানিয়ার পথচলা আজ এক বৈপ্লবিক সাফল্যে রূপ নিয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, মেধা আর পরিশ্রম থাকলে বর্জ্য থেকেও 'সোনা' ফলানো সম্ভব। তানিয়া আজ ৪০ জন নতুন উদ্যোক্তার মেন্টর। ১৮ জন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী।

তানিয়া পারভীনের শুরুটা ছিল অভাব আর অনিশ্চয়তায় ঘেরা। স্বামী বেকার, ব্যবসায় বারবার ব্যর্থতা- সব মিলিয়ে সংসার চালানোই ছিল দায়। পরিবারের হাল ধরতে তিনি যখন 'ভার্মি কম্পোস্ট' বা কেঁচো সার উৎপাদনের কথা ভাবলেন, সমাজ এমনকি তার নিকটজনেরাও তাকে উপহাস করেছিলেন। মহামারির সময় অনেকে তার হাতের খাবার খেতেও অনীহা প্রকাশ করত। কিন্তু তানিয়া দমে যাননি। ৫টি কেঁচোর শেডের ওপর ভর করেই তিনি তার লড়াই চালিয়ে গেছেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (LDDP) ছোঁয়ায় তানিয়ার ব্যবসায় আসে আমূল পরিবর্তন। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি পান আধুনিক বায়োগ্যাস প্লান্ট ও উন্নত মেশিনারিজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার উৎপাদনের বিশেষ প্রশিক্ষণ। আধুনিক বিপণন ও ব্যাবসায়িক কৌশলের জ্ঞান।

প্রকল্পের এই সহায়তার ফলে তানিয়ার খামারে মাসিক সার উৎপাদন ১০ টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০ টন। মাসিক গড় আয় মাত্র ১০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হয়েছে। তানিয়ার উদ্যোগটি এখন আর কেবল ব্যক্তিগত লাভের বিষয় নয়। তিনি গ্রামের ৬০টি পরিবার থেকে নিয়মিত গোবর সংগ্রহ করেন, যা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখছে এবং ৬৪টি পরিবারকে রান্নার জন্য বায়োগ্যাস সরবরাহ করছেন। এর ফলে গ্রামটি যেমন পরিচ্ছন্ন থাকছে, তেমনি সাধারণ মানুষের জ্বালানি খরচও কমছে। তার উৎপাদিত ভার্মি কম্পোস্ট জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনছে, তাই কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি বলেন,

> "এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় আমি আধুনিক বায়োগ্যাস ও সার উৎপাদন শিখেছি। এখন আমার লক্ষ্য দেশব্যাপী এই সার বিপণন করা এবং একটি আধুনিক ডেইরি খামার গড়ে তোলা।"

তানিয়ার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এই ব্যবসার আরও সম্প্রসারণ করা এবং একটি বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা, যাতে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নারীরা বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে পারে। আসলে সঠিক প্রযুক্তি আর সাহসের মেলবন্ধন ঘটলে উপহাসও একদিন সম্মানে পরিণত হয়।

রোকসানার দইঘর : অন্ধকার থেকে আলোর গল্প

রংপুরের এক সাধারণ গৃহবধূ রোকসানা বেগম। জীবনটা চলত আটপৌরে নিয়মেই। কিন্তু আকস্মিক ঝড়ে যখন স্বামীর চাকরি চলে গেল, তখন চার সদস্যের পরিবারে নেমে এল ঘন অন্ধকার। সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া যখন অনিশ্চিত, তখন রোকসানা কেবল কাঁদেননি; বরং তার হাতের অসাধারণ রান্নার শৈলীকে বেঁচে থাকার শক্তিতে রূপান্তর করেছেন। আজ তার হাতের তৈরি দই কেবল একটি খাবার নয়, বরং রংপুরের ডেইরি শিল্পের এক আস্থার নাম। রোকসানা এখন স্বপ্ন দেখছেন তার 'বেস্ট কোয়ালিটি দইঘর'-এর শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার।

২০১৮ সাল। একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে দইয়ের অর্ডার দেওয়ার মতো টাকা ছিল না। রোকসানা তখন বুক ভরা সাহস নিয়ে মাত্র ১৫০ টাকা দিয়ে সরঞ্জাম কিনে নিজেই দই তৈরি করেন। সেই অনুষ্ঠানে ৩৫০ জন অতিথি দইয়ের স্বাদ পেয়ে অভিভূত হয়ে যান। সবার সেই প্রশংসা রোকসানার মনে স্বপ্নের বীজ বপন করে- 'আমিও পারি'। বোনের সাহায্য নিয়ে ছোট পরিসরে শুরু হয় 'বেস্ট কোয়ালিটি দইঘর'। রোকসানার সংগ্রাম যখন একটি পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তার পাশে এসে দাঁড়ায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি ১২,৪৫,০০০ টাকার আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পান। রোকসানার ভাষায়, "এলডিডিপি আমাকে নতুন করে জন্ম দিয়েছে।" এই সহায়তায় তিনি দই তৈরির আধুনিক মেশিনারি কেনেন এবং দইয়ের পাশাপাশি মিষ্টি ও বিভিন্ন ডেসার্ট উৎপাদন শুরু করেন।

এখন রোকসানা পণ্য উৎপাদনে প্রতিদিন ব্যবহার করেন প্রায় ২৫০ কেজি দুধ। তার এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে ৫ জন নারী-পুরুষের। তিনি আজ কেবল একজন উদ্যোক্তা নন, তিনি তার পরিবারের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। যে স্বামী একসময় চাকরি হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন, আজ তিনি রোকসানার ব্যবসার প্রধান সহযোগী। 'বেস্ট কোয়ালিটি দইঘর' আধুনিক প্যাকেজিং ও হাইজেনিক পরিবেশ নিশ্চিত করার ফলে এখন খুচরা বাজারের গণ্ডি পেরিয়ে পাইকারি বাজারেও রাজত্ব করছে।

> "একসময় সন্তানদের ছোট ছোট চাওয়া পূরণ করতে পারতাম না। আজ এলডিডিপি'র সহায়তায় আমি শুধু নিজের পরিবার চালাই না, ৫ জন মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছি। আত্মমর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার আনন্দই আলাদা।"

তিনি চান তার এই দক্ষতা অন্য নারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে। রোকসানা বেগম দেখিয়ে দিয়েছেন- চরম অভাবেও যদি কারো হাতের নৈপুণ্য আর মনের সাহস অটুট থাকে, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিতেও নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব।

সাধারণের অসাধারণ গল্প
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়